আবৃত্তি শিক্ষার সহজ পাঠ

বেণী মজুমদার

মান্না পাব্‌লিকেশন
৩০/১ বি কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন
৩০/১ বি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ ঃ নভেম্বর, ২০০১

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম বসাক

লেজার টাইপসেটিং ঃ
আলফা লেজার পয়েন্ট
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর ঃ
নবলোক প্রেস
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কোলকাতা-৭০০ ০০৬

কৈশোরে যিনি আমায় কবিতার প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন সেই আমার মা
শ্রীমতি পঙ্কজরেণু মজুমদারকে

এবং

পরবর্তীকালে যিনি আমাকে উদ্বোধিত করেন সেই আমার শিক্ষক
শ্রী অশোক পালিতকে

◻ নিবেদন ◻

আবৃত্তি বিষয়ক আমার প্রথম বই 'ছোটদের আবৃত্তি শিক্ষা' পর পর সংস্করণ হয়ে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সে বইটিতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাওয়ার ফলে আমার মধ্যে একটা ঝোঁক বা প্রবণতা বা বলা যেতে পারে দায়বদ্ধতাই আমাকে দিয়ে 'আবৃত্তি শিক্ষার সহজ পাঠ'—নামে আর একটি বই লিখিয়ে নিলো।

আবৃত্তির কোনো সহজপাঠ হয় নাকি? আবৃত্তিকাররা কী বলবেন জানি না, আমার মতো সাধারণ বুদ্ধির লোক কিন্তু মনে করে, যা আবৃত্তিকে চিনতে শেখায়, বুঝতে আর ভালোবাসতে শেখায় তাই আবৃত্তি শিক্ষার সহজপাঠ।

বইটির কলেবর বৃদ্ধি না করে আবৃত্তিপ্রেমী ও শিক্ষার্থীদের ক্রয়ক্ষমতা নাগালের মধ্যে রাখবার জন্য কোন কবিরই একটার বেশি কবিতা রাখা সম্ভব হলো না। কিছু কবিতা সংগ্রহ করতে গিয়ে কবিদের ঠিকানা যোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু কবিতাগুলি আবৃত্তিযোগ্য বলেই ছাপা হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের পর কবি বা কবির উত্তরাধিকারী যোগাযোগ করলে আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে অনুমতি প্রার্থনা করার ও সৌজন্য সংখ্যা দেবার সুযোগ পেলে খুশী হবো।

বইটির প্রকাশ সম্বন্ধে প্রথমেই বলতে হয়, কবি ও আবৃত্তিকার শ্রী অশোক পালিতের কথা। তাঁর সহৃদয় হস্তক্ষেপেই এ বই এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে পারলাম। আবৃত্তিপ্রেম যে মানুষকে কতটা নিঃস্বার্থ বা উদার করতে পারে, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।

এ বইটি লিখতে সংশোধন করতে গিয়ে আরও বহুজনের উৎসাহ, প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, অভিনেতা, কবি ও আবৃত্তিকার শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অশোক পালিত আমার আবৃত্তি বিষয়ক কিছু প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিয়ে বইটিকে আরো মূল্যবান করে তুলেছেন। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রাবন্ধিক গবেষক অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয়ের লেখা দুটি এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করলাম। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের সকল আবৃত্তিকার, শিক্ষার্থী ও আবৃত্তিপ্রেমীদের পরামর্শ ও অভিমত কামনা করে শেষ করছি।

বেণী মজুমদার

সূচীপত্র

আবৃত্তি

(পাঠ্যক্রম)

প্রাক্-প্রাথমিক বর্ষ

—ব্যবহারিক—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি ও একটি ছড়া মুখস্থ।

প্রাথমিক বর্ষ

—ব্যবহারিক—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের যে কোন একটি কবিতা আবৃত্তি। স্বনির্বাচিত যে কোন একটি ছড়া মুখস্থ (উপরোক্ত কবি ছাড়া)।

—শাস্ত্র—

আবৃত্তির সংজ্ঞা।

উচ্চারণের বিভিন্ন দিক। অক্ষর, বর্ণ, মাত্রার সংজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বলা।

এ বর্ষের শাস্ত্র পরীক্ষা মৌখিক হইবে।

প্রথম বর্ষ

—ব্যবহারিক—

নিম্নলিখিত কবির যে কোন দুটি নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুকুমার রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসু।

যে কোন একটি কবিতার অংশ বা গদ্যাংশ পাঠ। স্মৃতি থেকে স্বনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (উপরোক্ত কবি ছাড়া)

—শাস্ত্র—

আবৃত্তির সংজ্ঞা ও মৌলিক গুণাবলী (বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ) ছন্দ—সংজ্ঞা ও প্রকাশ ভেদ। ছেদ, যতি, মাত্রা—সংজ্ঞা, পার্থক্য আবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ।

ধ্বনি—বিজ্ঞান অনুসারে স্বরের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আলোচনা।

নাটক ও সঙ্গীত থেকে আবৃত্তির পার্থক্য

জীবনী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম।

দ্বিতীয় বর্ষ

(জুনিয়র ডিপ্লোমা)

—ব্যবহারিক—

নিম্নলিখিত কবির নির্বাচিত ৪টি কবিতা আবৃত্তি ঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবনানন্দ দাশ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণেন্দু পত্রী।

স্মৃতি থেকে স্বনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি (উপরোক্ত কবি ছাড়া)।

যে কোন কবিতার অংশ বা গদ্যাংশ পাঠ।

যে কোন কবিতা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুখস্থ এবং আবৃত্তি।

—শাস্ত্র—

ছন্দ—মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা। এই তিন প্রকার ছন্দের প্রকারভেদ ও প্রয়োগ।

বাঙলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য, বাঙলায় অক্ষরের মাত্রা সংখ্যা যে অনির্দিষ্ট তা উদাহরণ সহ বুঝান।

অভিনেতা ও আবৃত্তিকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য। ছান্দসিক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের মূল্যায়ন।

জীবনী ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ, সুকান্ত।

—তৃতীয় বর্ষ—

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট ওয়ান)

—ব্যবহারিক—

যে কোন ৪টি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কবিদের সুনির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি। এছাড়া বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

যে কোন একটি অনুবাদ-কবিতা আবৃত্তি।

স্মৃতি থেকে সুনির্বাচিত কবিতা, গদ্যাংশ ও কাব্যনাট্য আবৃত্তি।

যে কোন একটি কাব্যনাট্য অংশবিশেষ পাঠ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

—শাস্ত্র—

আবৃত্তি শিল্প কিনা—আবৃত্তিকার শিল্পী কিনা—মতামত।

আবৃত্তির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, শিশির কুমার ভাদুড়ি ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অবদান ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ।

আবৃত্তি একটি প্রয়োগ শিল্প—আলোচনা।

আবৃত্তির ক্ষেত্রে তাল, লয় ও সুরের প্রয়োগ।

বাঙলা কবিতার ছন্দকে, তিনটি বৃত্তে ভাগ না করে তিন ঢঙ-এর বলে বর্ণনা করার সার্থকতা।

আবৃত্তি ও কবিতা পাঠের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা।

আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োজন আছে কিনা।

—চতুর্থ বর্ষ—

(সিনিয়র ডিপ্লোমা পার্ট টু)

—ব্যবহারিক—

নিম্নলিখিত কবির যে কোন পাঁচটি কবিতা আবৃত্তি ঃ

জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অশোক পালিত ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

যে কোন একটি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা আবৃত্তি। দু'জন বিদেশী কবির অনুবাদ-কবিতা আবৃত্তি।

যে কোন একটি গদ্যাংশ বা নাট্যাংশ পাঠ।

আবৃত্তির গবেষণা ও তার ফলাফল পর্যালোচনা।

আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্প—এবিষয়ে মতামত। আবৃত্তির বিভিন্ন রস নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা।

আবৃত্তির সংযোগ লোকসাহিত্যের সঙ্গে আলোচনা।

আবৃত্তিকার হিসাবে শম্ভু মিত্র ও কাজী সব্যসাচীর মূল্যায়ন।

শ্রুতিনাটক আবৃত্তি হিসাবে কতখানি গ্রহণযোগ্য—আলোচনা।

পঞ্চম বর্ষ

(সিনিয়র ডিপ্লোমা)

ব্যবহারিক

নিম্নলিখিত কবির কবিতা আবৃত্তি—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শামসুর রহমান, নাজিম হিক্‌মত, জসীমউদ্দিন, মজনু মোস্তাফা।

যে কোন তিনজন বিদেশী কবির কবিতা আবৃত্তি।

সাহিত্যের অংশবিশেষ পাঠ ঃ—

রক্ত করবী— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পথের পাঁচালী— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুতাপ—প্রবোধকুমার সান্যাল।

—শাস্ত্র—

প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত শাস্ত্র বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত কবির কাব্যরীতির দর্শনতত্ত্ব পর্যালোচনা ঃ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বাংলার প্রথম কবি ও আবৃত্তিকার কে? এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য আলোচনা।

'কাজী সব্যসাচী আবৃত্তি শিল্পকে জনপ্রিয় করেছে'—যৌক্তিকতা বিচার।

'কাব্যনাট্য ও নাট্যকারের পার্থক্য। স্মৃতি থেকে গদ্য কি আবৃত্তি? কেন?'

সমোচ্চারিত শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ সহ বুঝান।

কবি ও আবৃত্তিকারের রীতি বিচার ও মূল্যায়ন।

প্রবন্ধ ঃ আবৃত্তির মূল ভিত্তি কী—ছন্দ না ভাব।

ষষ্ঠ বর্ষ

(আবৃত্তি ও বিশারদ)

পার্ট ওয়ান

—ব্যবহারিক—

নিম্নলিখিত কবির কবিতা আবৃত্তি—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস ও জসীমউদ্দিন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা আবৃত্তি।

গদ্যাংশ পাঠ। যে কোন বিদেশী কবির কবিতা আবৃত্তি।

—শাস্ত্র—

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আবৃত্তির ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাংলা কাব্যে বিদেশী কবিদের প্রভাব নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

কবিতার শরীর ছুঁতে পারলেও আবৃত্তি কি শিল্প—আলোচনা।

সমার্থক শব্দ কাকে বলে? সমার্থক শব্দকে প্রতিশব্দ বলে কেন?

আবৃত্তিকার হিসাবে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক পালিত, প্রদীপ ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বসু, শাঁওলী মিত্র, উৎপল কুণ্ডু, পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের অবদান ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ।।

বাংলা ছন্দ রচনার তিন রীতি সম্পর্কে আলোচনা।

দেশীয় ও বিদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যানুসারে রচিত মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যগুলিকে মহাকাব্য বলা যায় কি না—যদি বলা যায় তাহলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় এই ধারালুপ্তির কারণ আলোচনা।

সপ্তম বর্ষ

(আবৃত্তি বিশারদ)

—ব্যবহারিক—

প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত ব্যবহারিক বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত কবির কবিতা আবৃত্তি—

অমিয় চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও জয় গোস্বামী।

—শাস্ত্র—

ঈশ্বরগুপ্ত যুগসন্ধির কবি—আলোচনা।

বাংলা কবিতার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা।

বাংলা সাহিত্যে আদিগুরু—জয়দেব, কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

কোন্ কোন্ বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়—আলোচনা।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরীশ চন্দ্র ঘোষের মূল্যায়ন।

বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য রচনার সূচনাপর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব আলোচনা।

মহাকাব্য রচয়িতারূপে মাইকেল-প্রতিভার মূল্যায়ন।

আবৃত্তি হচ্ছে অন্তরের অনুভূত জ্ঞান, উপলব্ধি, আবেগ প্রকাশ—এ সম্বন্ধে অভিমত সম্বলিত রচনা।

১

প্রসঙ্গ ঃ আবৃত্তি

বহু প্রাচীন কালে আর্যযুগে চৌষট্টি কলার মধ্যে দুটি কলার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে, একটি 'সংপাঠ্য' অপরটি 'মানসি কাব্যক্রিয়া'। সংপাঠ্য বলতে বুঝি যে বিষয়কে সম্যকভাবে পাঠ করা হবে। এর সোজাসুজি অর্থ বর্তমান 'আবৃত্তি' বোঝায়। 'মানসী কাব্যক্রিয়া' বলতে যা বোঝান হচ্ছে, তা হচ্ছে উত্তম কাব্যপাঠ। সংস্কৃত টীকায় এই শব্দের ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে স্বরের যথাযথ জ্ঞান, মাত্রা, সন্ধি, সংযোগ. অসংযোগ, ছন্দ, বিন্যাস প্রভৃতি ঠিকভাবে অনুসরণ করে পাঠ করা হলে সেটিকে 'মানসী কাব্যক্রিয়া' বলে অভিহিত করা যাবে।

লেখার পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত ঋকবেদের শ্লোকাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়নি মুখ্যত একটি কারণে—লেখাপড়ার চেয়ে আবৃত্তির উৎকর্ষতা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লেখ্যরূপের বয়স প্রায় হাজার বছরের। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কৃত চর্যাপদই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লেখ্যরূপের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। আদি পর্ব ও মধ্য পর্ব। আদি পর্বের বিস্তার দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বাঙালীর সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা থাকার জন্য একটানা দুশ বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ বাংলার সিংহাসনে বসলে নতুন করে সাহিত্য সৃষ্টির আয়োজন দেখা দেয়। এই সময়টিতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্য পর্বের সময়সীমা। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চারশ বছর ব্যাপী এই মধ্য পর্বের সময়সীমা। তারপর কিছুকাল চলে কবিওয়ালাদের যুগ। কবি ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই কবিওয়ালাদের যুগও শেষ হয়। যাত্রা শুরু হয় আধুনিক যুগের।

ঈশ্বরগুপ্তকে বাংলা সাহিত্যের 'জেনাস' বলা হয়। গ্রীকদেবতা জেনাসের দুটি মুখের একটি গতদিনের দিকে, অপরটি আগামী দিনের দিকে। ঈশ্বরগুপ্তও তেমনি, এই জন্যই তাকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়।

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিব্যক্তিত্বরূপে জয়দেব সর্বজনস্বীকৃত বলা চলে। পদাবলী-রচয়িতা জয়দেবের কাব্যের একটিমাত্র বিষয়বস্তু হোলো—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সহজ-সুন্দর ছন্দরীতিতে রচিত জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র একই সঙ্গে আবৃত্তি ও সঙ্গীতযোগ্য আদর্শ পাঠ।

জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ব্যবধান প্রায় তিন শতকের। প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্য-স্রষ্টা হলেন চণ্ডীদাস। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের মতো এমন জনপ্রিয় কবি মধযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল। চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যত বিতর্ক হয়েছে, এত বিতর্ক বোধহয় প্রাচীন অন্য কোন কবিকে নিয়ে হয়নি। অতি সহজ-সরল ভাষায় তিনি তাঁর বৈষ্ণব পদগুলি রচনা করেন। তাঁর পদগুলিতে আগাগোড়া শ্রীরাধার ধ্যানসমাহিত উদাসীন মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। রাধা আক্ষেপের সুরে বলেন—

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই
সুখের সাগরে ডুবে অবধি না পাই
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়

এই হৃদয়-নিঙড়ান আর্তিই চণ্ডীদাসের পদাবলীর মূল সুর।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের অপর বৈষ্ণবসাহিত্য-স্রষ্টা হলেন বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিদ্যাপতি বাঙালী নন। তাঁর বৈষ্ণব কবিতার ভাষাও বাংলা নয়। তিনি ছিলেন মিথিলার লোক। বিদ্যাপতি যে ভাষায় বৈষ্ণবপদগুলি রচনা করেছিলেন, তার নাম 'ব্রজবুলি'। এই ব্রজবুলি নামকরণ আধুনিক। উনিশ শতকের আগে শব্দটির ব্যবহার ছিল না। ব্রজবুলি কথাটি শুনলে অনেকের মনে হতে পারে এটি বুঝি ব্রজধামেরই ভাষা। কিন্তু আসলে ব্রজবুলি কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। এটি একটি কৃত্রিম মিশ্র ভাষা। বিদ্যাপতি যখন বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন, তখন তিনি সম্ভবত তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলীতে পদগুলি লিখেছিলেন। পরে সেগুলি বাংলা আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে যখন প্রচারিত হয় তখন তাতে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ ঘটে একটি মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হয়। এই মিশ্র ভাষারই নাম দেওয়া হয় ব্রজবুলি। এই ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেন।

বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি, রাজা ও তাঁর পরিষদ্‌বর্গের মনোরঞ্জনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ফলে তাঁর পদগুলিতে আবৃত্তির উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'আবৃত্তি' শিল্পটি আজকের নয়, বহু পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে এর প্রচলন ছিল এবং এর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হোতো। পুঁথি নির্ভরতা তো আমাদের আদিকাল থেকেই, এবং কবিখ্যাতি পেতে গেলে গৌড়েশ্বরের অথবা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ পেতে হতো, মুখে মুখে নানারকম পুঁথি পড়ে শোনাতে হোতো। শ্রুতিমাধুর্যের জন্য করতে হতো সুর-সংযোগ। কখনো বা গ্রহণ করতে হতো অভিনয়-রীতি, যেমন 'কথকতা'। এ ছাড়া আর একটি মাধ্যম অতীব প্রাচীন, তা হলো মুখে মুখে 'ছড়া-পাঠ।'

একসময় উইলিয়াম কেরীর দৌলতে পঞ্চানন কর্মকারদের সহায়তায় শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় গদ্য, ছন্দোবদ্ধ ও মুক্তছন্দ পদ্য, গদ্য-কবিতা ইত্যাদি রাজসভা থেকে উঠে এসে জনসভায় ছড়িয়ে পড়লো। সাথে সাথে কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি ব্যাপ্ত হয়ে গেল সর্বসাধারণের মধ্যে। সেই সাথে কবিদের দায় বাড়লো, দায় বাড়লো পাঠকেরও।

মধুসূদন আবৃত্তি-যোগ্যতাকেই কবিতা বলে বিশ্বাস করতেন। আবৃত্তির যে একটি নিজস্ব শিল্পরীতি আছে—বাঙালি কবি হিসেবে তিনিই প্রথম এই সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন। মধুসূদনকে নিজে আবৃত্তি করে শুনিয়ে শ্রোতা ও পাঠককে প্রস্তুত করতে হয়েছে—অমিত্রাক্ষর পড়ে বোঝাতে হয়েছে। এইজন্যই মধুসূদনকে বাংলার প্রথম আবৃত্তিশিল্পী বলা হয়।

মধুসূদন আবৃত্তির শিক্ষা পেয়েছিলেন বিদেশী কাব্য আবৃত্তি থেকে। তিনি কাব্য বা নাটক রচনাকালে প্রতিটি শব্দ বাক্য পঙক্তি বারবার আবৃত্তি করতেন এবং পরিপূর্ণ শ্রুতি সন্তোষলাভ না হওয়া পর্যন্ত রচনার পরিবর্তন ও সংশোধন কাজ করে চলতেন। মধুসূদন যে কবিতাপাঠ করতেন না, আবৃত্তি করতেন, তার প্রত্যক্ষ একটি প্রমাণ দিচ্ছি। এই দৃষ্টান্তটি থেকেই বোঝা যাবে, মধুসূদনই প্রথম বাংলার আবৃত্তি সচেতন অথবা পারঙ্গম কবি, আবৃত্তিকে যিনি একটা স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে গণ্য করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—

'তাঁহার (অর্থাৎ মধুসূদনের) গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা-ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি মেঘনাদ বধের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় পড়িয়া..... শুনাইতেছিলেন। তখনও মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতাপাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, এক টানে বলিয়া যাইতেন,—যথা, সম্মুখ-সমরে-পড়ি-বীর-চূড়া-মনি- বীর-বাহু-চলি-যবে-গেলা-যম-পুরে-অকালে-কহ-হে-দেবী—' ইত্যাদি। যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না।

মধুসূদন প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হোলো, তাঁর সমগ্র রচনায় অন্তত ষাট শতাংশ (গদ্য ও পদ্য) আজো আবৃত্তি উপযোগিতায় সমুজ্জ্বল।

পরবর্তীকালে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সৃজনকল্পে ও পরিবেশন পরিকল্পনায় গৈরিশ ছন্দে আখ্যায়িত হয়। নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের চতুর্দশ-অক্ষরা চরণ ভেঙে ভাবানুযায়ী ছেদ অনুসারে চরণ রচনা ক'রে নাটকীয় সংলাপের উপযোগী ক'রে তোলেন। আবৃত্তি ও অভিনয় এই সময় থেকেই হাত ধরাধরি ক'রে চলতে শুরু করে। গৈরিশ ছন্দ প্রায় একশো বছর নাট্যজগতে রাজত্ব করেছে।

সংলাপ-আবৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই তিনি নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নির্দেশ দিতেন—"ওরে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্।"

গৈরিশ ছন্দের পরিসমাপ্তি ঘটে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

১৯০৮ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটের সভ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি তার মুখে সবসময় লেগে থাকত। তখন সংস্কৃত আবৃত্তির চল ছিল। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করার আগেই শিশিরকুমার আবৃত্তিকার ও অভিনেতারূপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নজর কেড়েছিলেন ও অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার পরস্পর পরস্পরের আবৃত্তি শুনতে অসাধারণ উৎসাহী ছিলেন।

শিশিরকুমারের কথা শেষ করার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। মধুসূদন-গিরিশচন্দ্রের মতো শিশিরকুমারও আমৃত্যু জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন।

শিশিরকুমারের সমসাময়িক কালে সংস্কৃত আবৃত্তিতে সেরা ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট আয়োজিত আন্তঃ-কলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হন সুনীতিকুমার।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের আবৃত্তি একসময় বাঙালীর মনে নব প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। একক কবিতাপাঠ ও আবৃত্তির স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকেই শুরু হয় এবং এই কারণে পরবর্তীকালে সমস্ত আবৃত্তিকারই বাঙলা আবৃত্তির পথিকৃৎরূপে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় কবির কণ্ঠ ছিল পরিশীলিত, উদাত্ত, জোরালো এবং সুস্পষ্ট-উচ্চারণ সমৃদ্ধ। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এক সাহিত্যসভায় প্রায় দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা দেবার পর শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে খালি গলায় বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাইতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বরভঙ্গের শিকার হন এবং এর কিছুকাল পরেই তিনি স্থায়িভাবে গলরোগে আক্রান্ত হন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ভঙ্গি এ যুগে ঠিক বোঝানো যাবে না। রথীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথার এক জায়গায় লিখেছেন,—'রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের যে ভাঙা গলাটি বাজায় সবাই—সেটা আদৌ রবীন্দ্রনাথের আসল কণ্ঠস্বর নয়। তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তাঁর স্বরভঙ্গ ঘটেছে এটি সেই সময়ের গলা।'

রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেন। প্রখ্যাত সংগীত বিশারদ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর এক রচনাতে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি সম্বন্ধে বলেছেন,—'তিনি আবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং যখন আবৃত্তি করতেন তখন তাঁর অসামান্য পার্সোনালিটিতে মুগ্ধ হলেও আবৃত্তির আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করে গত্যন্তর ছিল না।'

সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে আমরা একটা কথা স্বীকার করতে পারি যে সকল আবৃত্তিকারেরই ধাত্রীভূমি হলো রবীন্দ্র-আবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে, স্বাধীনতার সেই সংগ্রামী যুগে, আবৃত্তিকে গ্রামে-গঞ্জে নিয়ে যাওয়ার যিনি পুরোধা, তিনি হচ্ছেন কাজী নজরুল, নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তখনকার দিনে এইভাবে কবিতা লিখে আবৃত্তি করতেন যারা, তাঁদের বলা হতো চারণকবি।

আকাশবাণী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আবৃত্তির দিকে সাধারণ মানুষের নজর পড়ে। আমরা ছোটবেলায় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি শুনতুম। সেই সময় তিনি 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন। তার পরবর্তীকালে আবৃত্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জনগণের কাছে আবৃত্তিকে একটা অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পরূপে তুলে ধরলেন শম্ভু মিত্র। শুধুমাত্র আবৃত্তির আঙ্গিকগত দিকই নয়, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ইত্যাদি কবির কবিতার ভাব, রস ও তাৎপর্যকে শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছে দিলেন তাঁর আবেগপ্রবণ অনন্য কণ্ঠের কুশলতায়।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে জনসমাবেশগুলোতে নাচ, গান, নাটকের সঙ্গে আবৃত্তির অনুষ্ঠানও হোতো। ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যে বিদেশী কবিদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো। মায়াকোভস্কি, নাজিম হিক্‌মত, ঝাক প্রেভের, বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌ ল্যাংস্টন হিউজ থেকে শুরু করে প্রগতিশীল পৃথিবীর তাবড় কবিরা অনুবাদের সূত্রে এসে পৌঁছলেন বাংলা কাব্যের অন্তঃপুরে। কখনো কবিরা, কখনো আবৃত্তিকাররা সেই সব কবিতার আবৃত্তির অনুষ্ঠানের আয়োজনে, আবৃত্তিশিল্পকে একটা বৈপ্লবিক চরিত্র এনে দিলেন।

আবৃত্তির বাণিজ্যিক তথা আনুষ্ঠানিক সাফল্যের কাজে সবচেয়ে কৃতিত্ব যিনি দেখিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন—কাজী সব্যসাচী। সেই সঙ্গে তিনিই ছিলেন আবৃত্তিকে শিল্পের মর্যাদা দেবার ব্যাপারে প্রথম সক্রিয় উদ্যোক্তা। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান, তৈরি করেছিলেন কিছু ছাত্র-ছাত্রী যারা তাঁর স্বরক্ষেপণ, ছন্দোবিভাজন, কণ্ঠচর্চার পদ্ধতিতে পরবর্তীকালে শিক্ষিত হয়েছিলেন। কাজী নজরুলের কবিতার আবৃত্তিযোগ্যতাকেই আয়ত্ত করেই তিনি তাঁর মন্ত্রমধুর কণ্ঠের সুবাদে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

এই সময় রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কবিতার রূপ ও ভূমিকা বদলে গেল অনেকখানি। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল, কবিতার ছন্দে তালে বিপ্লবের উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে নতুন প্রজন্মের কবিরা এগিয়ে এলেন, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা আবৃত্তি শিল্পকে নতুন করে

বিকশিত হতে সাহায্য করলো। সেই সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাৎক্ষণিক স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিতেন।

ষাটের দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়রা স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য প্রতি বছর হাজির হতেন ময়দানের মুক্ত মেলায়। তুষার রায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

'তুষার মুখে মুখে তাৎক্ষণিক ছড়া বানিয়ে মুগ্ধ করত আমাদের। ময়দানের মুক্ত মেলায় এক পুলিশের প্রতি তুষারের সেই বিখ্যাত উক্তি—পুলিশ কবিকে দেখে টুপিটা তুই খুলিস!' (দ্রঃ 'দেশ' সংখ্যা ২০মে, ১৯৯৫)

আবৃত্তি আজ একটি জনপ্রিয় শিল্প হিসেবে পরিগণিত। প্রাচীন কবি থেকে আধুনিক কবিদের কবিতা আজ আবৃত্তিকারদের কাছে সবিশেষ সমাদর পাচ্ছে। রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, এ্যাকাডেমি, গিরিশমঞ্চের মতো মাধ্যম তৈরি হয়েছে পশ্চিমবাংলার বুকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার জন্য। অত্যন্ত আনন্দের কথা বিগত কয়েক বছর ধরে নূতন নূতন শিল্পী এইসব মাধ্যমগুলোতে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন।

আবৃত্তির সংজ্ঞা ও মৌলিক গুণাবলী

"কবিতা—আবৃত্তি একটি চমৎকার শিক্ষা। বিভিন্ন ধরনের পদ্য ও গদ্যপাঠে নমনীয়তা ও অভিব্যক্তির ক্ষমতা বাড়ে। মন্ত্র ও ছন্দোবদ্ধ পদ ঝংকার উচ্চারণের স্পষ্টতা, কাব্যছন্দের বিভিন্ন কৌশল, জ্ঞান ও বোঝাপড়ার উন্নতি সাধন করে।"

(প্রসঙ্গক্রমে)—চারলস্ ডব্লিউ লোমেস

আবৃত্তি সম্পর্কে বলতে গেলেই সেই শাস্ত্রবাক্যটি প্রথমেই, মনে পড়ে 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরিয়সি।' প্রাচীনকালে ভারতীয় মুনি-ঋষিরা আবৃত্তিকে গুরুত্ব দিতেন। সে কালে ছাপাখানার প্রচলন না থাকায় মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যেত না। অতএব আবৃত্তিকেই ভাবতেন অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় ও বোধ সৃষ্টির প্রথম ধাপ। এজন্যই তাঁরা সর্বশাস্ত্রের বোধের চেয়েও আবৃত্তিকে গৌরবজনক ভাবতেন।

অতঃপর ছাপার হরফে কবিতার প্রকাশ ও প্রচারের যুগ এলো। এ রেওয়াজ চালু হওয়ার পর শুরু হলো চোখ দিয়ে দেখে আর মনে-মনে পাঠ না করে কণ্ঠস্বরের সাহায্যে কাব্যমাধুর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। আর এই চেষ্টাই একসময় নিছক পাঠকে কোরে তুললো 'আবৃত্তি'।

আবৃত্তির সংজ্ঞা ঃ আবৃত্তি কাকে বলে? মূল রচনা চোখের সামনে রেখে দেখে দেখে বলাকেই বলা হয় পাঠ, আর কবিতাটিকে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে শ্বাসযতি বা ছন্দযতির আশ্রয়ে কণ্ঠের সাহায্যে অভিব্যক্ত করার নাম আবৃত্তি। যিনি আবৃত্তি করবেন, তাঁকে কবিতাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে, তা আত্মস্থ করেই বলতে হবে। তবেই

আবৃত্তি সার্থক হয়ে উঠবে। মূল কথা হল, কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে যে কথাটা বলতে চেয়েছেন আবৃত্তিকার সেই কথাটা শ্রোতাদের পৌঁছে দিতে পারছে কিনা, অর্থাৎ কবির অনুভূতি ও মনন তাঁর শ্রোতাদের হৃদয়ে তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পারছেন কিনা। আবৃত্তির জন্য দীর্ঘ অনুশীলন দরকার। বলা যায় পাঠের সিঁড়ি বেয়ে আবৃত্তির মঞ্চে উঠতে হয়।

আবৃত্তি আর পাঠ এক কিনা?

ইদানীংকালে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন, 'আবৃত্তির পক্ষে কোন্‌টি ঠিক, পাঠ করা অথবা স্মৃতি থেকে বলা।' আসলে, 'আবৃত্তি' শব্দটির সঙ্গে এমনই একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে "বার বার বলা।" সেই অর্থে দেখে পড়লেও সেটা নিশ্চয়ই আবৃত্তি, কেননা আবৃত্তি তো পুনরুচ্চারণ। তবে শ্রোতাদের কথা মনে রেখে আবৃত্তি স্মৃতিনির্ভর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা ভাবানুযায়ী আবৃত্তিকারের মুখ-চোখের পরিবর্তন আসে, ফলে শ্রোতারা তা দেখতে পান এবং শ্রোতাদের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়।

ভাষাবিজ্ঞানী ড. পবিত্র সরকারের অভিমত ঃ 'আবৃত্তি' আর 'পাঠ' আক্ষরিকভাবে আলাদা করা হয় সম্ভবত মুখস্থ বলা আর দেখে পড়ার হিসেব থেকে। আমার মনে, এ দুয়ের তফাৎ কিছু নেই, মুখস্থটা ওর‍্যাল ট্র্যাডিশনের স্মৃতি ছিল, লেখা ও মুদ্রণের যুগে পাঠের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। (দ্রঃ আবৃত্তির অ আ ক খ ঃ উদয় কুমার চক্রবর্তী)

আবৃত্তির মৌলিক গুণাবলী ঃ সব শিল্পেরই একটা মৌলিক গুণ থাকে। আবৃত্তির ক্ষেত্রেও আছে। আবৃত্তির উদ্দেশ্যই তো কবিতাকে ব্যাপক শ্রোতৃবর্গের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া এবং এভাবেই শ্রোতা কবিতার মধ্যে ডুব দিয়ে তুলে আনতে পারে দু'একটা উপলব্ধি।

আবৃত্তির কাছে থেকে মূলত তিনটি জিনিস আমরা পেতে পারি।

(১) আনন্দিত মুহূর্তের সমর্থন। (২) শোকার্ত মুহূর্তের সান্ত্বনা। (৩) পরাস্ত মুহূর্তের সাহস।

কবিতার কাছ থেকে আমরা আমাদের আনন্দিত মুহূর্তের সমর্থন পাই। যেমন ধরা যাক, একদিন বিকেলে পার্কে বেড়াচ্ছি। দেখতে পেলাম একটি গাছে ফুল ফুটে আছে। একটি প্রজাপতি ইতস্তত ফুলটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। এই সময় আমি যদি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাসান রাজার বাড়ি' কবিতার এই পংক্তিটা গুনগুনিয়ে নিজেই নিজেকে শোনাই, 'আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভ্রমর'... তো, বুঝতেই হবে যে, ওই পংক্তির মধ্যে রয়েছে আমি যে আনন্দিত হয়েছি, ওই আনন্দের সমর্থন।

আবৃত্তির কাছে আমরা শোকার্ত মুহূর্তের সান্ত্বনা পাই। আমি নিজে একজনকে ভীষণ দুঃখের সময় আবৃত্তির ক্যাসেট শুনতে দেখেছি। আবার শোক সামলে বাঁচবার প্রেরণাও

আবৃত্তির কাছ থেকে পোত পারি। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'বোঝাপড়া' কবিতায় আমরা পাই—

'অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলায় পাহাড় ছিল,
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠলো কেঁপে আর্তরবে—
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?'

এইসবই হচ্ছে আবৃত্তির কাছ থেকে আমাদের মোটা দাগের প্রাপ্তি।

এ ছাড়াও আবৃত্তির অন্যতর মূল্য কম নয়। প্রথমত যিনি আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত তিনি কবিতাকে কবিতা-উদাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভেতর নিয়ে যেতে পারেন। দ্বিতীয়ত আবৃত্তিকারের আবৃত্তি শুনে কান আর মন শিক্ষিত হয়ে উঠলে জনসাধারণ শিল্পসংস্কৃতি-সচেতন হয়ে উঠবে। দেশপ্রেমের ভিত্তি হয়ে উঠবে দৃঢ়তর। আবৃত্তিকার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রকারান্তরে কবিতার মস্ত বড় বন্ধু কবিদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি, পাঠকদের বিশ্বস্ত সহযোগী।

এছাড়া আবৃত্তিকারের নিজের কাছে আবৃত্তির মূল্য কম নয়। আবৃত্তি অনুশীলনই একমাত্র কণ্ঠস্বরকে পুষ্ট ও উচ্চারণকে বিশুদ্ধ করে। জিহ্বার জড়তা দূর করে। সর্বোপরি, আবৃত্তি দেয় ব্যক্তিত্ব, মনকে করে পবিত্র, পরিশীলিত, রুচিবান।

এসব কথা বিবেচনা করেই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে আবৃত্তিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে আবৃত্তিশিল্পটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন আবৃত্তি শেখানোর ক্লাসে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাও আবৃত্তি শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম নির্দেশ করেছেন।

লোকসংস্কৃতি ও আবৃত্তি ঃ 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি দুটি দিককে স্পর্শ করে রয়েছে। একদিকে লোকশিল্প অন্যদিকে লোকসাহিত্য—এই দুটি দিককে স্পর্শ করেই লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে আবৃত্তি লোকসাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কেননা তা মৌখিক, শ্রুতিনির্ভর এবং উচ্চারণ-নির্ভর বলে। এই স্মৃতিভিত্তিক লোকসাহিত্য কখনো কখনো সুরকেও তার অঙ্গ করে নিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে গাথা বা গীতিকা।

আজও আমাদের দেশে চণ্ডিপাঠের আসর বসে, নানা দেবদেবীর পাঁচালী পাঠ হয়। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে বহু গৃহস্থের ঘরে আষাঢ় মাসের প্রতি-দুপুরে মনসার পাঁচালী বা পদ্মপুরাণ পাঠ হয়। রায়বেঁশে, ভাদু বা ভাদের পুজোয় আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। পরকুলের টুসু পরবে পৌষ সংক্রান্তির দিন সুর করে আবৃত্তি করা হয় ঃ 'হলুদ বনের টুসু তুমি হলুদ কেন মাখ না/শ্বশুরঘরে আমার টুসুর হলুদ মাখা সাজে না।'

এমনকি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল ময়নানগরে নিদ্রাসঞ্চারে এই আবাহনী রচনা করেছেন—

"জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ্ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর।'

যেহেতু লোকসাহিত্যে মূলত স্মৃতিভিত্তিক রচনা, সে কারণে রচনার অবিকৃতির জন্য গদ্যের চাইতে পদ্য ছন্দরই বেশি চল ছিল।

নাটক ও সঙ্গীত থেকে আবৃত্তির পার্থক্য ঃ

আবৃত্তির জন্মদাতৃ মনে হয় দৃশ্যাভিনয়। শেক্সপীয়রের বহু নাটকে আবৃত্তির স্থান আছে। আমাদের বাংলাভাষাতেও গিরিশ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের নাটকে আবৃত্তির বিশিষ্ট স্থান আছে। এইসব আবৃত্তিতে নাটকীয়তা এসে পড়বে। সেই সঙ্গে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যপাঠে আবৃত্তি এবং অভিনয়ের পারস্পরিক সংযোগ ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। গল্পটা দেবনারায়ণ গুপ্তর কাছ থেকে শোনা।—একবার শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর ছাত্রাবস্থায় গিরিশবাবুর কাছে গিয়েছিলেন, আবৃত্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে। তিনি নাট্যাচার্যের বাগবাজারের বাড়ির কাছে গিয়েও কি ভেবে ফিরে চলে আসছেন, এমন সময় গিরিশবাবু তাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কী চাও বাবা?'

শিশির কুমার নম্র মধুর কণ্ঠে বললেন, 'আজ্ঞে, আপনার কাছে এসেছিলাম জানতে যে, আবৃত্তির কিছু নিয়ম আছে কিনা?'

গিরিশবাবু হেসে বললেন, 'সে কথা পরে বলছি। আগে বলো তো তুমি 'মেঘনাদবধ কাব্য পড়েছো?'

'হ্যাঁ পড়েছি।'

'অমুক জায়গাটা মুখস্থ বলতে পারো?'

'পারি।'

'বলো তো।'

শিশিরবাবু সেই জায়গাটা ভারি সুন্দর করে আবৃত্তি করলেন। গিরিশবাবু আবৃত্তি শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন, 'তুমি ভালো আবৃত্তি করতে পারবে আর সেই সঙ্গে অভিনয়ও।'

মহাকাব্যের মতো গীতিকাব্য পাঠেও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আবেগের স্বতঃস্ফূর্তি শুধু আবৃত্তিরই নয় অভিনয়েরও গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের আবৃত্তিতে অভিনয় রীতির মিশ্রণ ছিল। আগে আবৃত্তি ও অভিনয় ছিল সুরেলা। আবৃত্তি প্রভাবিত করতো অভিনয়কে, অভিনয় আবৃত্তিকে। আবার অপর দিকে সঙ্গীতও আবৃত্তি আর অভিনয় থেকে গ্রহণ করতো ভাবুকতা। আবৃত্তি সম্পূর্ণ সঙ্গীতধর্মী না হলেও তার শিল্প প্রক্রিয়া অনেকটা কাছাকাছি। আজকাল আবৃত্তি ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে সুরের ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

তাহলে কথা উঠতে পারে আবৃত্তি কি অভিনয়ের তুল্যমূল্য? এর উত্তর—'তুল্যমূল্য' শব্দটা এখানে ব্যবহার না করে সম্পর্ক শব্দটা ব্যবহার করলে ভালো হয়। আবৃত্তি অভিনয়ের অংশ হলেও কোথাও একটা সীমা আছে। সেটা ধরতে পারলেই বা বুঝতে পারলেই তফাৎটা বোঝা যাবে। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশনগত দিক থেকে একটা পার্থক্য বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। আবৃত্তিতে নাটকের মতো অ্যাকশন্ দেওয়া কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। যদি সমর্থন করতে হয় তাহলে, আলো, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবহার মেনে নিতে হয়। আবৃত্তিকারকে তাই মঞ্চে আসতে হয় সম্পূর্ণ একা এবং শূন্য হাতে। কেবল তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়া আর কোন উপকরণ নেই। তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হন উন্মুক্ত মুখাবয়ব, উন্নত শির আর ঋজু দেহ নিয়ে। এই উপকরণহীন বলেই আবৃত্তি একটি স্বতন্ত্র শিল্প। কিন্তু স্বতন্ত্র শিল্প বলতে এই নয় যে, তার সঙ্গে অন্য কোন শিল্পের সম্পর্ক নেই। আবৃত্তি নিজের গুণগত অর্থেই একটি স্বতন্ত্র ও অনন্য শিল্প।

অভিনেতা ও আবৃত্তিকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ঃ

অভিনয় একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যাতে অনেকের সহযোগিতায় একটি দৃশ্যকে বা একটি বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়। অভিনেতার স্থান সঙ্কীর্ণ, কেবল তাঁর অংশটুকু কণ্ঠের সাহায্যে অভিব্যক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আবৃত্তির রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখানে আবৃত্তিকারকে সমগ্র কবিতাটি গভীর অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ কাব্যে যতগুলি রস প্রস্ফুটিত হয়েছে সেই সবগুলিই তাঁর একক প্রচেষ্টায় ফুটিয়ে

তুলতে হবে। আবৃত্তির ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির ওপর একাধিক অভিনেতার দায়িত্ব এসে পড়ে।

আবৃত্তি একটি প্রয়োগ শিল্প ঃ

সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। সাহিত্য ও আবৃত্তি এই দুয়ের মূল উপাদান শব্দ। সাহিত্যের শব্দ ধ্বনিময় নয়। একজন আবৃত্তিকার সাহিত্যের বিষয়কে ধ্বনিরূপে তাঁর উচ্চারণে তুলে আনেন, সেখানে যুক্ত করেন বাক্যের ছন্দস্পন্দ, অভিব্যক্তির উত্তাপ, কণ্ঠের মাধুর্য। শ্রোতা, আবৃত্তিকারের মাধ্যমে তাঁর সেই উচ্চারণ থেকে ধ্বনিরূপে সাহিত্যের বিষয় গ্রহণ করেন। এইজন্য আবৃত্তি সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল বা সাহিত্যধর্মী বলা যেতে পারে।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে, যে অর্থে সাহিত্য একটা মৌলিক সৃষ্টি, আবৃত্তি তা হবে কি করে? আবৃত্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম বলি কি করে?

আবৃত্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প হিসাবে স্বীকার করতে গেলে তার মধ্যেও কয়েকটি মৌলিকতা থাকবে। তার একটি নিজস্ব রীতি থাকবে এবং সেই রীতি অবলম্বন করে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে প্রতিটি যোগ্য আবৃত্তিকার। আমাদের বক্তব্য, আবৃত্তি এক শিল্পনির্ভর প্রয়োগ শিল্প অর্থাৎ কবিতা বা গদ্য নামের ভাষাশিল্পের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা বাক্‌শিল্প।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শিল্প হিসাবে আবৃত্তির প্রতিষ্ঠা আবৃত্তিকারের অনেকখানি প্রস্তুতি এবং অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে।

যে কোন শিল্পমাধ্যমকে প্রয়োগ করতে গেলে শিল্পীর নিজস্ব গোপন কিছু নান্দনিক উত্তরণের প্রয়োজনে দুটি পর্ব থাকে। প্রথম পর্বে শিল্পী বিষয়কে নির্বাচন করে তাঁর মনের ভেতর তার রসবোধকে, নিজস্ব শিল্পপ্রক্রিয়ায় গ্রহণ করেন। এরপর দ্বিতীয় পর্বে সেই বিষয়কে নিজস্ব শিল্পপ্রক্রিয়ায় কণ্ঠের সাহায্যে শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। এই নিজস্ব প্রয়োগকুশলতা থেকেই স্বাধীন শিল্পী হয়ে আবৃত্তিকারের সার্থকতা প্রতিপন্ন হতে পারে।

আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োজন আছে কিনা?

আবৃত্তিকে প্রয়োগ শিল্প বলার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে, এই শিল্পের সঙ্গে আজকাল যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার। আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার শ্রোতাকে হয়তো মুগ্ধ করতে পারে কিন্তু আবৃত্তিশিল্পকে স্বনির্ভর এবং শক্তিশালী করেনা। আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত, আলো ইত্যাদির অনুষঙ্গ আবৃত্তিকে নেহাতই প্রয়োগশিল্পে পরিণত করে।

তাহলে আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহার কি করবো না? প্রশ্নটা বোধহয় অবান্তর। গানের পাশে সঙ্গত থাকতে পারে, নাচের পিছনে গান বা সঙ্গত থাকতে পারে, তাহলে আবৃত্তির সঙ্গে থাকবে না কেন? আমার তো মনে হয় আবৃত্তির সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার কবিতার ভাবমণ্ডলকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে।

তবে এ ব্যাপারে সবটাই আবৃত্তিকারের পছন্দ অপছন্দর উপর নির্ভর করছে।

আবৃত্তি কি সঙ্গীতের মতো স্বরলিপি নির্ভর হওয়া উচিত? আবৃত্তির ক্ষেত্রে স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

নীরদবরণ হাজরা শ্বাসাঘাত, কম্পিতস্বর, স্বরের তীব্রতা নিয়ে আবৃত্তির স্বরলিপি তৈরি করেছেন। এই স্বরলিপি অনুসরণ করে আবৃত্তি করা উচিত কিনা তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাল্মীকি'-পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে জানান, 'গানের ক্ষেত্রে স্বরলিপির ব্যাপারটা এসেছে যুগে যুগে চর্চা করতে করতে। সমস্ত ব্যাপারটা বিরাট, প্রগাঢ়, সাংঘাতিক বড় হতে হতে। তখন যাঁরা এটাকে ভালো বেসেছেন, তাঁরা মনে করেছেন এইভাবে এই জিনিসটা চালালে হয়। তখন তাঁরা স্বরলিপির পত্তন করেন। যেমন দ্বিজেন ঠাকুর করেছেন, রবীন্দ্রনাথ করেছেন। তবে আবৃত্তি এখনও অত প্রগাঢ় বিরাট আকারে এসে পৌঁছয়নি তো, তাই আবৃত্তির ক্ষেত্রে স্বরলিপিও আসেনি। আর ওটা এক্ষুনি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তাও নেই বলে মনে হয়। (দ্রঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনয় ও আবৃত্তি, বাল্মীকি, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮৯)।'

২

কণ্ঠস্বর

'গভীর উপলব্ধির কণ্ঠ তৈরির জন্য স্বরপ্রক্ষেপণের অনুশীলন দরকার।'—(দ্রঃ প্রসঙ্গ ঃ নাট্য—শম্ভু মিত্র)

কণ্ঠ সাধনা আবৃত্তি শিক্ষার প্রথম ধাপ। কণ্ঠস্বর কি, সেটা বুঝতে হলে তার বস্তুগত চেহারাটা বুঝে নেওয়া দরকার। মানুষের বাক্‌সমৃদ্ধির উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কতে আছে ২০ কোটিরও বেশি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন। এই নিউরোনকে দুভাগে ভাগ করা হয়—White matter আর Grey matter। এই গ্রে ম্যাটারের মধ্যেই আছে আমাদের Intelligence বা বুদ্ধি। এদের সক্রিয়তার ও অনুভবনের ফলে মানুষ দেখতে, শুনতে, বলতে ও অর্থ করতে পারে।

কিন্তু ধ্বনি সৃষ্টির যন্ত্র স্বরযন্ত্র। এর আবার অনেকগুলো অংশ আছে ঃ মুখগহ্বর, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, মাড়ী, কোমল তালু, কঠিন তালু, আলজিব, গলবিল (ফ্যারিংস), স্বরযন্ত্র (ল্যারিংস), শ্বাসনালী (ট্রাকিয়া), নাসিকা গহ্বর ইত্যাদি। এইগুলির নাম বাক্‌প্রত্যঙ্গ। এই বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক।

আমরা জীবনধারণের জন্য শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করি। যে বাতাস আমরা নাক ও মুখ দিয়ে গ্রহণ করি সেটি শ্বাসনালীর (ট্রাকিয়া) সাহায্যে ফুসফুসে যায়। ছাড়ার সময় ঐ বাতাস স্বাভাবিকভাবে ফুসফুস থেকে শ্বাসনালীতে ও সবশেষে মুখ ও নাক দিয়ে যায়। আমাদের ফুসফুস অনেকটা স্পঞ্জের মতো। ফুসফুস সংযুক্ত থাকে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালীর সাথে। শ্বাসনালীর মধ্যের অংশটি একটি ফানেলের আকারের। এই অংশটিকে বলা হয় গলবিল (ফ্যারিংস)। এর ঠিক নিচেই থাকে স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংস। ট্রাকিয়ার শেষ অংশ ও ল্যারিংসের প্রথমাংশের কিছুটা জুড়ে থাকে দুটি পাতলা পর্দা। ওই পর্দা দুটিকে বলে ভোকাল কর্ডস বা স্বরতন্ত্রীদ্বয়। আমরা যখন বুকের ভেতর থেকে বাতাস টেনে স্বরযন্ত্রের ভেতর দিয়ে পাঠাই তখন স্বরতন্ত্রীদ্বয় যদি পথরোধের চেষ্টা না করে, তবে সে বাতাস নাক ও মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, ফলে কোনরকম স্বরোৎপাদন হয় না। যদি স্বরতন্ত্রীদ্বয় পথ অবরোধ করে বাধার সৃষ্টি করে, তখন নিশ্বাসবায়ুর ধাক্কায় স্বরতন্ত্রীদ্বয় কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের ফলে যে স্বর উৎপন্ন হয়, তাই আমাদের কণ্ঠস্বর।

এই স্বরতন্ত্রীকে কাঁপাতে শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি হচ্ছে ফুসফুসের বাতাস। এই বাতাস এসে আঘাত করে স্বরতন্ত্রীতে। তার থেকেই ধ্বনির সৃষ্টি। কিন্তু এই ধ্বনিসৃষ্টিকে কার্যকর করতে ফুসফুস, ট্রাকিয়া, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, মুখগহ্বর ও নাসিকা-গহ্বরের ভূমিকা প্রধান। এজন্য আবৃত্তিকারকে শ্বাস নিয়ন্ত্রণের কলা-কৌশল জানতে হয়।

নারী ও পুরুষের স্বরতন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরুষদের স্বরতন্ত্রী স্বাভাবিক অবস্থায় লম্বায় বড় হয়। পুরুষদের থেকে নারীদের স্বরতন্ত্রী সব সময়েই ছোট হয়। আবার পুরুষদের স্বরতন্ত্রী নারীদের স্বরতন্ত্রীর থেকে একটু কম পুরু হয়। লম্বা ও চওড়ার এই ভেদ থেকেই নারী-পুরুষের স্বরের তারতম্য ঘটে।

আবৃত্তি করার সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপাতে হয়। কাঁপাবার সময় স্বরতন্ত্রী সঙ্কুচিত হলে উঁচু পর্দার স্বর আর প্রসারিত হলে নিচু পর্দার স্বর সৃষ্টি হয়। এই পর্দাকেই স্বরগ্রাম বলে। স্বরগ্রামের ওঠানামা এবং স্বরের এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় যাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হলে স্বরের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় জানা দরকার। মনোভাবের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ধ্বনি-বিজ্ঞান অনুসারে স্বরের বৈশিষ্ট্য চারটি।

(ক) স্বরের তীব্রতা ঃ শ্বাস বের হবার সময় বাক্‌তন্ত্রীর ওপর টান পড়ে, সেই অনুসারে স্বরের দ্রুততা, মৃদুতা ও তীব্রতা সৃষ্টি হয়। সচেতন প্রচেষ্টায় শ্বাসের চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে স্বরের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাকেই স্বরের 'তীব্রতা'র নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। প্রথমেই 'আ' স্বর উচ্চারণ করে এই অভ্যাস করা যেতে পারে।

(খ) স্বরের গভীরতা ঃ উচ্চারণের সময় যত বেশি পরিমাণে শ্বাসবায়ু একযোগে বের হয়, স্বরে তত গভীরতা আসে।

(গ) স্বরের রঙ ঃ স্বরের কোমলতা বা কর্কশতা। স্বর থেকে গড়িয়ে আসার সময় মধ্যবর্তী স্থানে দু'-একটা অপেক্ষাকৃত নরম স্বর উঁকি দেয়। এই স্বরগুলিকেই কোমলস্বর বলা হয়। কোন কবিতায় উদাস, মধুর বা বিষণ্ণ অভিব্যক্তি আনতে কোমল স্বরের ব্যবহার খুবই উপযোগী।

(ঘ) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কাল পরিমাণ ঃ যতক্ষণ ধরে বাকযন্ত্র কোন বিশেষ স্থানে থেকে কোন দল (Syllable) উচ্চারণ করে, তার ওপরেই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে।

ডায়াফ্রাম ব্রিদিং

এই পদ্ধতিটি আয়ত্ত করতে গেলে প্রথমে মেঝের উপর শিথিলভাবে বসতে হবে। দু পায়ের পাতার সবটা মেঝেতে বসানো থাকবে। পা দুটি থাকবে পাশাপাশি সংলগ্ন। এবার হাতদুটো পেটের উপর এমনভাবে রাখুন যাতে আঙ্গুলের মাথাগুলো প্রায় ছুঁয়ে যাবার অবস্থায় থাকে। এরপর পরিপূর্ণভাবে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন। এই সময় পেটটি নিঃশ্বাস নেবার সময় ফুলে উঠবে ও ছাড়ার সময় চুপসে যাবে। কয়েক সপ্তাহ অভ্যাস করলে স্বরবৈচিত্র্যের পদ্ধতিটি আয়ত্তে আসবে ও স্বরগ্রামের গভীরতা বাড়বে।

সাধারণ মানুষের চেয়ে কণ্ঠজীবীকে বেশি স্বরোৎপাদন করতে হয়। এজন্য তার পর্যাপ্ত পরিমাণে দম আটকে রাখার ক্ষমতা এবং সেই দমকে প্রয়োজন মতো ধীরে ধীরে ছাড়বার বা নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি থাকা আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রিত গভীর শ্বাসক্রিয়ার নাম 'প্রাণায়াম'।

প্রাণায়াম

প্রথমে পিঠ সোজা করে বোসে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডানদিকের নাকের ছিদ্রটি বন্ধ করুন। এবার বাঁদিকের নাকের ছিদ্রটি দিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে থাকুন। শ্বাস নেওয়া হয়ে গেলে কুড়ি সেকেণ্ড দম বন্ধ করে রাখুন। এইবার কড়ে আঙ্গুলের সাহায্যে বাঁদিকের ছিদ্রটি বন্ধ করুন ও বুড়ো আঙ্গুলটি ডান নাক থেকে তুলে ফেলুন। এইবার ডান নাক দিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড ধরে ধীরে ধীরে বাতাস বের করে দিন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কিছুদিন ধরে করে যান। স্বর উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে। আমাদের শ্বাসনালীতে, গলায়, মুখে ও নাকে এমন কতকগুলি তন্ত্রী আছে যেগুলি কেঁপে কেঁপে যে স্বর সৃষ্টি হয় তাকেই অনুনাদ বলা হয়। স্বরতন্ত্রীর কাঁপার হার যতই বাড়তে থাকবে ততই ধ্বনি হাল্কা ও তীক্ষ্ণতর হবে। এই কাঁপার হারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অনুনাদের জন্য মুখগহ্বর ও নাসিকা গহ্বর ব্যবহার করতে হয়। এর জন্য গলায় কোন বাড়তি চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, ভাল অনুনাদ সৃষ্টি করতে গেলে নিম্নচোয়াল, কোমল তালু, জিহ্বা ও ঠোঁটের নমনীয়তা আনা দরকার। নমনীয়তার জন্য সামান্য কয়েকটি ব্যায়াম ও প্রতিদিন কয়েক মিনিটের অনুশীলনই এর জন্য যথেষ্ট।

জিভ আর ঠোঁটের মাংসপেশীগুলো যদি শিথিল করা যায়, চোয়ালটি যদি স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করে, তবে অনুনাদ সৃষ্টিতে কোন বাধা আসবে না।

জিহ্বার আড়ষ্টতা কাটাতে ব্যায়াম ঃ

(১) প্রথমে বিস্তৃতভাবে হাঁ করতে হবে। এবার জিভটিকে বাইরে যতটুকু সম্ভব বের করে আনুন ও ছুঁচালো গঠন তৈরি করুন। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন।

(২) জিভের ডগা দিয়ে লম্বালম্বি ও কোণাকুণি ভাবে পর্যায়ক্রমে উপরের ও নিচের দাঁতে আলগা ভাবে স্পর্শ করুন।

(৩) জিভকে প্রথমে মুখের ভেতরে ও পরে বাইরে বৃত্তাকারে ঘোরান। ধীর গতিতে শুরু করে পরে দ্রুত গতিতে ঘোরাবার চেষ্টা করুন।

ঠোঁটের ব্যায়াম ঃ *ঠোঁটদুটির* অবস্থান ও আকৃতির পরিবর্তনের ফলে বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণ সৃষ্টি হয়। নিচের ঠোঁট সহজেই নড়ান যায়। কিন্তু উপরের ঠোঁটকে ব্যায়ামের সাহায্যে নমনীয় করতে হয়। নিচে অনুশীলনের জন্য তিনটি ব্যায়াম দেওয়া হলো।

(১) ঠোঁট দুটি পরস্পর যুক্ত না করে হাসার মতো ঠোঁটের দুই প্রান্ত প্রসারিত করুন।

(২) উপরের ঠোঁটটি একবার উপরের দিকে ও একবার পেছন দিকে সম্প্রসারিত করুন।

(৩) ঠোঁটদুটির সাহায্যে নানারকম আকৃতি তৈরি করুন। কোন সময় ছোট আবার কোন সময় মাঝারি ও বড় বৃত্তের আকার সৃষ্টি করুন। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন।

চোয়ালের ব্যায়াম ঃ আমাদের নিম্ন-চোয়ালটি মাংসপেশীর সম্প্রসারণের ফলে নিচের দিকে ঝুলে যায়। চোয়ালের এই ঝুলে যাওয়াটিকেই কাজে লাগাতে হবে। চোয়ালটির মধ্যে কোনরকম কাঠিন্য ও উত্তেজনা থাকলে চলবে না। নিচের ব্যায়ামগুলো অভ্যাস করলে চোয়ালটি নমনীয় হবে।

(১) চোয়ালটিকে ধীরে ধীরে উপরে ও নিচে স্বাভাবিকভাবে ওঠান ও নামান। এই সময় সমস্ত রকম উত্তেজনা পরিহার করতে হবে।

(২) একখণ্ড আখের টুকরো চিবোন। এই ব্যায়ামটি সত্যিকারের বা কাল্পনিক বস্তুর সাহায্যেও করা যেতে পারে।

কোমল তালুর ব্যায়াম ঃ প্রথমে নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করে দিতে হবে। এইভাবে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জন করলেই কোমল তালুটি কর্মতৎপর হবে।

এম্‌ফ্যাসিস ঃ

এম্‌ফ্যাসিস ব্যবহারের দু'রকম কার্যকারিতা আছে, খুব সহজে এবং দুলিয়ে বা প্রলম্বিত করে শব্দটিকে বলা যায়। অপরটি হচ্ছে শব্দটিকে অধিক অর্থবহ, আবেগময় ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।

উদাহরণ ঃ শব্দকে ভেঙ্গে উচ্চারণ করে।

১। 'আ-আ-আছ্‌-ছা'। ২। 'এ-এ-এ-এই কথা ৩। 'অঅঅঅসভ্য'

বিশেষ সুর ব্যবহার করে

'নন্দিনীইইইইই'—

(রক্তকরবী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বেশিরভাগ সময় কবিতার একটি পংক্তির মধ্যেই পর পর দুটি বা তিনটি শব্দের উপর জোর দিতে হতে পারে, যেমন—

দিগন্তে আরক্ত রবি
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন **বিষণ্ণ ভৈরবী।**
শাল তাল তমালের **মিলিত মর্মরে**
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে
যেন **তিলকের রেখা** সন্ন্যাসীর **উদার** ললাটে।

(পঁচিশে বৈশাখ - রবীন্দ্রনাথ)

৩
উচ্চারণ

'যাহার আবৃত্তি সুস্পষ্ট ও প্রমাদ শূন্য নহে, তাঁহার অভিনয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রত্যেক কথার প্রত্যেক বর্ণটি নির্ভুল করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। মুড়ি ও মিছরীর কখনো একদর হইতে পারে না, পার্থক্য থাকবেই থাকিবে।'

—ফনিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

উচ্চারণ আবৃত্তি-চর্চার অন্যতম অঙ্গ। স্বরযন্ত্রের মতো উচ্চারণ যন্ত্রেরও (বাগযন্ত্র) ব্যবহার নানারকম। গলা, নাক, জিভ, ঠোঁট, দাঁত, চোয়াল, কঠিন তালু ও কোমল তালু—এই আটটি হচ্ছে বাগযন্ত্র—উচ্চারণ যন্ত্র। বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় 'ধ্বনি', ধ্বনি লিখিত হয় 'বর্ণে'। বর্ণের সমাহারে আকার পায় 'অক্ষর', যেমন, পাখী— এই শব্দটিতে দুটি অক্ষর থাকে। কিন্তু বর্ণ আছে চারটি— প্+আ+খ্+ঈ। বাংলা বর্ণমালাতে মোট ৫০টি বর্ণ আছে, ১১টি স্বরবর্ণ। যথা—অ থেকে ঔ। বাংলায় ঋ, ৯-এর ব্যবহার নেই। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯টি। যথা—ক থেকে ँ। এদের মধ্যে ড়, ঢ়, য় যথাক্রমে ড, ঢ, য-এর রূপান্তর এবং অন্তঃস্থ 'ব' এর ব্যবহার বাংলায় নেই। ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান সম্পর্কে জানতে গেলে উঁচু ক্লাসের ব্যাকরণ বই দেখলেই চলবে।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

স্বরবর্ণের উচ্চারণ তিন রকম (সংস্কৃত হিসেবে)।

১। **হ্রস্ব**—উচ্চারণকালে অল্প সময় লাগে। অ, ই, উ—এই তিনটি হ্রস্ব।

২। **দীর্ঘ**—উচ্চারণকালে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে। আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই সাতটি দীর্ঘ।

৩। **প্লুত**—কান্না, দূর থেকে ডাকা, আবৃত্তি অথবা গান গাওয়ার সময় স্বর দীর্ঘতর হয়। যেমন—মাগো ও-ও-ও, ওরে মনি ই-ই-ই, ওরে সর্বনাশ হয়ে গে-এ-এলো-ও-রে এ, ইত্যাদি।

বর্তমানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে খুব একটা পার্থক্য দেখা যায় না। সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ বদলে বাংলায় নিজের নিয়মে হ্রস্ব-দীর্ঘ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবৃত্তির সময় শব্দকে উচ্চারণের মাধ্যমে তার অর্থকে ছুঁতে গেলে বা কোন চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গেলে স্বরবর্ণের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব উচ্চারণে চরিত্রের ভাব বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হয়। যেমন—মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। এখানে 'অনেক' শব্দটির স্বর দীর্ঘ বা প্রলম্বিত হবে। আবার 'না খাবো না'—কথাটির প্রথম 'না' উচ্চারণ যদি দীর্ঘ হয়, তবে শেষ 'না' হ্রস্ব। বাঙলায় সংযুক্ত বর্ণের পূর্বে থাকলে বা অনুস্বর বা বিসর্গের স-যুক্ত হলে,

প্রায় ক্ষেত্রে বিশেষত কবিতায়, দীর্ঘ হয়ই, হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যেমন, নিস্তার = নি-স্তার। ঈর্ষা = ঈ-র্ষা। উত্থান = উ-ত্থান। মনঃকষ্ট = মন-কষ্ট। আংশিক = আং-শিক।

'অ'-এর উচ্চারণ

বাংলাভাষার 'অ' স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ নিয়ে প্রায়ই বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। মুশকিলের কারণ বোধহয় এই যে 'অ' স্বরবর্ণটি অন্যান্য স্বরবর্ণ থেকে একটু আলাদা। 'অ'-এর দেখা লেখায় আমরা পাই শুধু শব্দের প্রথমে, আধুনিক বাংলায় 'অ' স্বরবর্ণটি শব্দের মাঝখানে বা শেষে কোথাও দেখা যায় না। 'অ'-এর ঐতিহাসিক উচ্চারণতত্ত্ব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের বইগুলি দেখে নিতে পারেন।

।। 'অ'-এর তিনরকম উচ্চারণ ।।

১। 'অ'-এর মতো উচ্চারণ। ২। 'ও'-এর মতো উচ্চারণ।

৩। হসন্ত-র মতো উচ্চারণ। অর্থাৎ অ-কারের উচ্চারণ লোপ।

'অ' 'ও' হওয়ার তিনটি প্রধান কারণ আছে। একটি স্বরসংগতির কারণ এটিই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক 'অ'-কে 'ও' করে দেয়। দ্বিতীয়টি শ্বাসাঘাতের কারণ আর তৃতীয়টি সহোচ্চারণের কারণ।

স্বরসংগতিগত

যদি বাংলা শব্দের প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এ 'অ' থাকে, কিন্তু পরবর্তী সিলেব্‌ল্‌-এ 'ই' বা 'উ' ধ্বনি থাকে—তাহলে উচ্চারণে ঐ 'অ' 'ও' হয়ে যাবে।

নিচে পাশাপাশি কিছু শব্দ সাজিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাঁদিকের শব্দগুলিতে 'অ' তার নিজস্ব উচ্চারণ বজায় রেখেছে। কিন্তু ডানদিকের শব্দগুলিতে প্রথম শব্দটি ঠিক আছে, কিন্তু পিছনে এসে বসেছে 'ই' বা উ—আর তাতেই 'অ'-টি আর 'অ' থাকছে না, 'ও' হয়ে যাচ্ছে।

অ-উচ্চারণ	ও-উচ্চারণ
অত	অতি (ওতি)
অমন	অমনি (ওমনি)
ঘট	ঘটি (ঘোটি)
ঘড়া	ঘড়ি (ঘোড়ি)
নদ	নদী (নোদি)
গত	গতি (গোতি)
বধ	বধূ (বোধূ)
করে	করুক (কোরুক)
বলে	বলুক (বোলুক)

কিন্তু 'ই' আর 'উ' থাকলেই স্বরসংগতি হবে তা না হলে - হবে না? বানানে 'ই' নেই এমন শব্দেও তো স্বরসংগতি ঘটে।

যেমন—

সত্য (সোত্যে)	লক্ষ্য (লোক্খো)
পদ্য (পোদ্দ্যো)	হত্যা (হোত্তা)
বাক্য (বাক্কো)	বক্ষ (বোক্খো)
সখ্য (শোক্খো)	নব্য (নোব্বো)
ঘাতক (ঘাতোক)	যজ্ঞ (যোগ্গো)

শ্বাসাঘাতগত

'অ'-কে 'ও' করার দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে যদি শব্দের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়ে তাহলে পরের সিলেব্ল্গুলিতে 'অ' থাকলে তা 'ও' হয়।

যেমন—

বাদল (বাদোল)	পাগল (পাগোল)
নকল (নকোল)	সাগর (সাগোর)

ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—মৃন্ময়, নির্ভয়, সম্ভব, ভয়ংকর ইত্যাদি।

সহোচ্চারণগত

১। শব্দের প্রথমে 'অ' যদি একটি র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসে তাহলে তা 'ও' হিসেবে উচ্চারিত হবে।

যেমন—

ব্রতো (ব্রোতো)	প্রণাম (প্রোণাম)
শ্রবণ (শ্রোবোণ)	প্রবেশ (প্রোবেশ)
প্রথম (প্রোথম)	প্রত্যেক (প্রোত্যেক)
শ্রম (শ্রোম)	ভ্রমর (ভ্রোমোর)
প্রভাত (প্রোভাত)	শ্রদ্ধা (শ্রোদ্ধা)

২। শব্দের প্রথম অক্ষরে (সিলেব্ল্-এ) 'অ' এবং তারপরে ন্, ম্, ং ইত্যাদি থাকলে ঐ 'অ', 'ও' রূপে উচ্চারণ হবে।

যেমন—

মন (মোন)	সময় (সোময়)
বন (বোন)	ধন (ধোন)

যেখানে 'অ'-এর উচ্চারণ লোপ হবে এবং হসন্ত-র মতো উচ্চারণ হবে।

যেমন—

হাত (হাত্) কর (কর্)

ভাত (ভাত্) মোর (মোর্)

বাংলায় বেশিরভাগ শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয়না। ওড়িয়ায় হয়। বাঙলায় 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ নানারকম হয়ে থাকে। কোথায় কেমন হবে তা সতর্কভাবে অনুধাবন করা দরকার। এখানে সব উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হলো না।

॥ আ-এর দু'রকম উচ্চারণ ॥

একাক্ষর পদ না হলে হ্রস্ব উচ্চারণ হবে। যেমন— আপন, কাপড়, আমি, নানা ইত্যাদি। একাক্ষর পদ হলে দীর্ঘ উচ্চারণ হবে।

যেমন— আ-জ, ভা-ত, আ-ম, কা-ল ইত্যাদি।

॥ ই ও ঈ-এর দু'রকম উচ্চারণ ॥

একাক্ষর পদ না হলে হ্রস্ব উচ্চারণ হবে। যেমন— ইনি, দিদি, দীনতা ইত্যাদি। একাক্ষর পদ হলে উচ্চারণ দীর্ঘ হবে। যেমন— ইট, দিন বা দীন ইত্যাদি।

॥ উ/ঊ-এর দু'রকম উচ্চারণ ॥

উনি, ঋতু, কুমার, ময়ূর (মৌউর) ইত্যাদির হ্রস্ব উচ্চারণ হবে। ঊট, উগ্র, ক্রুদ্ধ, ক্রূর ইত্যাদির উচ্চারণ দীর্ঘ হবে।

ঋ-কারের উচ্চারণ 'রি'-র মতো। যেমন—ঋষি = রিষি। ঋতু = রিতু। অমৃত = অম্রিত ইত্যাদি।

॥ 'এ'-র দু'রকম উচ্চারণ ॥

ছেলে, মেয়ে, একটি, দেশ, বেশ ইত্যাদি 'এ'র মতো উচ্চারণ হবে। এক (এ্যাক), কেন (ক্যানো), খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা), একা (এ্যাকা) ইত্যাদির উচ্চারণ 'এ্যা'র মতো প্রসারিত হবে।

ব্যতিক্রমও আছে। যেমন— সেক্, লেখ্, ছেঁড়্ ইত্যাদি।

'ঐ'-এর উচ্চারণ 'ওই' এবং 'ঔ'-এর উচ্চারণ 'ওউ' হয়। যেমন—ঐক্য ওইককো। চৈতন্য = চোইতোন্নো। গৌরব = গৌরব। বৌ = বউ।

॥ 'ও'-কারের উচ্চারণ ॥

'ও'-কারের উচ্চারণ ইংরেজী 'O' ধ্বনির মতো। যেমন— কোল, ঝোল, লোক, লোপ ইত্যাদির উচ্চারণ হ্রস্ব হবে।

স্বরধ্বনিগুলিতে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না, অনায়াসে স্পষ্টভাবে অন্য ধ্বনির সহায়তা

ছাড়াই উচ্চারিত হয়। কিন্তু জিভের অবস্থা (উচ্চারণ কালে সামনে প্রসারিত বা পেছনে), ঠোঁটের আকার (ঠোঁট দুটি কমবেশি প্রসারিত বা কুঞ্চিত), মুখবিবরের অবস্থান (সম্পূর্ণ খোলা বা অর্ধেক খোলা)-এর ওপর সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আবৃত্তি করার জন্য প্রতিটি আবৃত্তিকারের বাগযন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার জেনে নেওয়া দরকার।

বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ স্থানের তালিকা ঃ

বর্ণ ও নাম	উচ্চারণ-স্থান
অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ (কণ্ঠ বর্ণ)	কণ্ঠ্য
ই, ঈ, চ, ছ, ঝ, ঞ, য, শ (তালব্য বর্ণ)	তালু
ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ (মূর্ধন্য বর্ণ)	মূর্ধা
৯, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স (দন্ত্য বর্ণ)	দন্ত
উ, ঊ, প, প, ব, ভ, ম (ওষ্ঠ বর্ণ)	ওষ্ঠ
এ, ঐ (কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ)	কণ্ঠ ও তালু
ও, ঔ (কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ)	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
অন্তঃস্থ বা (দন্তৌষ্ঠ বর্ণ)	দন্ত ও ওষ্ঠ
ং (অনুস্বার) অনুনাসিকা বর্ণ)	নাসিকা
ঙ, ঞ, ণ, ন (অনুনাসিক)	প্রধানত নাসিকা

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

'ক' থেকে 'ম' এই ২৫টি ব্যঞ্জনবর্ণকে বলা হয় স্পর্শবর্ণ। কারণ এই বর্ণগুলো উচ্চারণের সময় জিভ, গলা, তালু, মূর্ধা বা তালুর মধ্যভাগ, ঠোঁট ও দাঁত স্পর্শ করে। ২৫টি স্পর্শবর্ণের মধ্যে ঙ এ ন ণ ম এই পাঁচটি নাসিক্য বর্ণ, কারণ এদের উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বের হয়। ँ (চন্দ্রবিন্দু) ও ং (অনুস্বার)-কেও নাসিক্য বর্ণ-র মধ্যে ফেলা যায়। ণ, ন, ও ম-র উচ্চারণ সামান্য অনুনাসিক হলে মিষ্টি শোনায়। ঙ-র উচ্চারণ অনুস্বারের মতো। এমন কি কণ্ঠবর্ণ ক, খ, গ, ঘ-এর সঙ্গে যুক্ত হলেও উচ্চারণের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন— ব্যাঙ = (ব্যাং)। শঙ্খ = (শংখ)। বর্তমানে ঞ-র ব্যবহার যুক্তাক্ষরেই দেখা যায়। সংযুক্ত বর্ণের আগে ঞ-র উচ্চারণ ন-এর মতো। যেমন— লাঞ্ছিত = (লান্ছিত)। গঞ্জনা = (গন্জনা)। আবার চ্-এর পর ঞ-র উচ্চারণ অনেকটা ন-র মতো। যেমন—যাচ্ঞা = (যাচ্না)। কিন্তু জ্-এর পরে ঞ-র উচ্চারণ নাসিক্য ধ্বনির মতো হবে। যেমন— আজ্ঞা = (আগ্গাঁ)। জ্ঞানী = (গ্যাঁনী)।

ণ-এর উচ্চারণ অনেকটা ন-এর মতো। কিন্তু তৎসম বানানের প্রয়োজনে এই 'ন' বর্ণটি টিকে আছে। এ বিষয়ে ণত্ব বিধান দ্রষ্টব্য।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দুই রকম

১। **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—ক, গ, চ, জ, ট, ড়, ত, দ, প, ব—এই বর্ণগুলির উচ্চারণ কালে অল্প বাতাস বের হয় বলে এগুলিকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে।

২। **মহাপ্রাণ বর্ণ**— খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ম, ধ, ফ, ভ—এই বর্ণগুলির উচ্চারণকালে জোরে বাতাস বের হয় বলে এগুলিকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়।

॥ র, ড়, ঢ়— এর উচ্চারণ ॥

এই তিনটি বর্ণ প্রাচীন বাংলায় ছিল না। এই তিনটি বর্ণের মধ্যে ড় ও ঢ়কে স্পর্শবর্ণের অন্তর্গত প্রতিবেষ্টিত বর্ণ বলে। 'ড়'-এর উচ্চারণে জিভের তলা দিয়ে দাঁতের গোড়ায় আঘাত করতে হয়। ড় ও ঢ়-এর উচ্চারণ অনেকটা 'র'-এর মতো। যেমন—গাড়ি, বাড়ি। 'ড়'—ক্ষণিক ধ্বনি। এর মহাপ্রাণ রূপ—'ঢ়'। 'ড়'-এর স্থানের 'র', কিংবা 'র'-এর স্থানে 'ড়' লিখলে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের অর্থের বিপর্যয় ঘটে থাকে। যেমন—বড়—বর, ধড়—ধর, চড়—চর, মড়া—মরা, বাড়ি—বারি, তাড়া—তারা, পড়া—পরা ইত্যাদি।

'র'-এর উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রবর্তী অংশকে কাঁপিয়ে সেই কম্পমান অংশের দ্বারা দন্তমূলে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করতে হয়। ইংরেজী 'r'-এর উচ্চারণ বাংলা 'র'-এর উচ্চারণ থেকে বিশেষ আলাদা। 'র'-এই বর্ণটি কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসে সংযুক্ত গঠন করলে এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন—বিক্রয় = (বিক্‌ক্রয়)। নম্র = (নম্‌ম্র)।

॥ শ, ষ, স-এর উচ্চারণ ॥

শ, ষ, স হচ্ছে—উষ্মবর্ণ। 'উষম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'নিঃশ্বাস'। যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ টেনে প্রলম্বিত করা যায় বলে এদেরকে উষ্মবর্ণ বলা হয়। 'শ'-এর উচ্চারণস্থান তালুতে। ষ-এর উচ্চারণস্থান মূর্ধায়। 'স'-এর স্থান দন্তে। এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ দু'রকম।

১। ইংরেজী 'sh'-এর মতো উচ্চারণ। যেমন—কষ্ট, সব, শব, সত্য, শস্য, সন্তান, শান্তি, সাধনা, সমস্ত, শিশির, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বীকার, শোষিত, ষষ্ঠীতলা, শিকার ইত্যাদি।

২। ইংরেজী 'S'-এর মতো উচ্চারণ। যেমন— শ্রী, শ্লীল, স্নান, শ্রাবণ, স্রষ্টা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, স্খলন, সমস্ত, স্তবক, স্তব্ধ, অস্থির, স্ফুলিঙ্গ, স্নান, স্নায়ু, ষ্টেশন ইত্যাদি।

'Sh'-এর মতো উচ্চারণের সময় জিভের মধ্যভাগ কঠিন তালুকে স্পর্শ করবে।

'S'-এর উচ্চারণের সময় জিভের ডগাটি দাঁত স্পর্শ করবে। 'Sh'-অ', 'S'-অ', 'Sh'-অ',—'S'-অ', এমনি করে বার বার বললে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এছাড়া নিচের অনুশীলনটিও রোজ অভ্যাস করতে পারেন ঃ

শ্যামবাজারের শ্রী সতীশ শর্মা সস্ত্রীক

Sh S Sh Sh Shs

বৃষ্টির মধ্যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে খুব

Sh S Sh

কষ্ট করে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ষষ্ঠীতলায় ফিরে এলেন।

Sh Sh Sh

॥ ম-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষর-এর উচ্চারণ ॥

ম-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষরগুলি উচ্চারণ সাধারণত স্পষ্ট 'ম'-এর মতো উচ্চারণ হয়। যেমন—উন্মাদ = (উন্‌মাদ)। কাশ্মীর = (কাশ্‌মীর)। যখন শব্দের প্রথমে থাকে তখন অনুচ্চারিত থাকে। যেমন—শ্মশান = (শশান)। যখন মাঝ বা শেষে থাকে তখন যে বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার দ্বিত্ব হয়। যেমন—লক্ষ্মী = (লোখ্‌খী)। পদ্ম = (পদ্দো)। আবার কোথাও একটু অনুনাসিক ধ্বনি থাকে। যেমন—মহাত্মা = (মহাত্তাঁ)। ভীষ্ম = (ভীশশোঁ)।

॥ য-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষর-এর উচ্চারণ ॥

শব্দের অন্তে বা মধ্যে (্য) য-ফলা থাকলে য-ফলাযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন—বাক্য = (বাক্‌ক)। বিদ্যা = (বিদ্দা)। আবার হ-এর সাথে, য-ফলা যুক্ত হলে হ এবং য-ফলা লুপ্ত হয়ে 'জঝ'-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন— বাহ্য = (বাজ্‌ঝো)। সহ্য = (সোজ্‌ঝো)'।

॥ ব-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষর-এর উচ্চারণ ॥

ব-ফলা কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গঠন করলে ব-ফলা লুপ্ত হয়ে আগের ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়। যেমন—অন্বয় = (অন্‌নয়)। সত্বর = (সত্‌তর)। ব-ফলা বর্ণের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হলে উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন—দ্বিত্ব = (দিত্‌তো)। স্বত্ব = (সত্‌তো)। আবার 'হ'-ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'ব' মহাপ্রাণিত হয়ে গিয়ে 'ভ'-এর মতো উচ্চারণ হয়। যেমন—জিহ্বা = (জিউভা)। আহ্বান = (আওভান)।

॥ সার সংকলন ॥

এই সুদীর্ঘ আলোচনা সংক্ষেপ করা দরকার। উচ্চারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। যারা আগ্রহী তাঁরা সাহিত্যসংসদ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানটি দেখে নিতে পারেন।

উচ্চারণের শুদ্ধতার পরেই আবৃত্তিকারের লক্ষ্য থাকবে কবিতাটি উপলব্ধি করে তার ভাব, প্রতিটি শব্দের অর্থ যথাযথভাবে শ্রোতার কর্ণগোচর করার দিকে। শ্রোতার কর্ণগোচর করতে গেলে কণ্ঠকে উচ্চগ্রামে তুলে (তীক্ষ্ণ বা কর্কশ নয়) মাইক্রোফোনকে সামনে না রেখে একটু তির্যকভাবে রেখে বা মুখ একটু নিচু করে বা প্রয়োজনে দূর থেকে বলা উচিত। মাইক্রোফোন ব্যবহারের সময় বেশি জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লে লাউডস্পীকারে শোঁ শোঁ আওয়াজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর জন্য চোরা দম নেওয়া যেতে পারে।

অনেকেই আবৃত্তি করার সময় নার্ভাস হয়ে পড়ে। ফলে হাত-পা কাঁপতে থাকে, গলা শুকিয়ে যায়।

এরজন্য আবৃত্তি করতে যাবার আগে শরীরের ওজন ছেড়ে দিয়ে দেহকে শিথিল করতে হবে। এজন্য শবাসন বিশেষ কাজ দেয়। ব্যায়াম বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আবার অনেকে আবৃত্তি করার সময় চোয়াল শক্ত করে আবৃত্তি করেন। চোয়ালে কাঠিন্য থাকলে ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ হতে বাধ্য। এরপর আসে জিভের কথা। স্পষ্ট উচ্চারণে জিভের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিভের ব্যবহার ঠিক না হলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ হবে। অনেক আবৃত্তিকার অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের ধ্বনি-বিজ্ঞানটি মেনে চলেন না। ফলে 'ব্যথা' 'ব্যতা'-তে পরিণত হয়, 'কথিত'-র পরিবর্তে শোনা যাবে 'কতিত'।

উচ্চারণের শুদ্ধতার পরই আবৃত্তিকারের লক্ষ্য থাকবে শব্দের অর্থভেদের রীতিটির প্রতি। কবিতায় প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা জানি প্রতিটি শব্দের বানান অনুসারে একটা নিজস্ব অভিধানগত অর্থ আছে। কোন শব্দের একাধিক অর্থও আছে। যেমন 'আবৃত্তি' বলতে আমরা পাঠ বুঝি, আর আবৃত্তি বলতে বুঝি আবরণ।

আবৃত্তিকার উৎপল কুণ্ডু তাঁর আবৃত্তি চর্চা বইতে উচ্চারণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছে—'উচ্চারণের শুদ্ধতার অভ্যাসের পরেও আরও একটা পর্যায় আছে। সেটিই প্রকৃতপক্ষে আবৃত্তিতে উচ্চারণ-শিক্ষা। তাকে আমরা 'উচ্চারণ-ব্যঞ্জনা' বলে অভিহিত করবো।

প্রতিটি ভাল কবিতার মধ্যে অনেক কিছু অনুষঙ্গ থাকে। যেমন—মাত্রা, ছন্দ, ভাবব্যঞ্জনা. স্বর ইত্যাদি। ভাল কবিতা হচ্ছে বোরখা ঢাকা রমণীর মতো। রমণী কখনো

কখনো সেই বোরখার আব্রুটা একটু সরিয়ে দেয়, আর চকিতে শরীরটা দেখা যায়, কিন্তু সবটা নয়। তাই দেখে আবৃত্তিকার তার নিজের অনুভব দিয়ে সেই দৃশ্যের ঘাটতি পূরণ করে নেয় ও তাঁর কণ্ঠে ভাবব্যঞ্জনায় উচ্চারিত হয়ে কবিতাটির ভিতরে যে লুকোনো ঐশ্বর্য ছিল তা দীপ্তি পেয়ে একেবারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রতিটি ভাল কবিতার মধ্যে একটা স্তর থাকে। সেই স্তরটা খুললে আরও একটা স্তর। আবৃত্তিকারের কাজ হচ্ছে উচ্চারণ-ব্যঞ্জনার সাহায্যে এই স্তরগুলো খোলা। 'ভাব' কথাটির অর্থ অনুভূতির আধিক্য। কোন জিনিস দেখলে, শুনলে বা পড়লে মনের মধ্যে হাসি, কান্না, রাগ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি 'ভাব'-এর সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতার মধ্যে এই 'ভাব'-এর যোগান দেয়। আবৃত্তিকার সেই ভাবকে উচ্চারণ-ব্যঞ্জনার দ্বারা কণ্ঠের সাহায্যে প্রকাশ করেন। আবৃত্তি ভাল হলে শ্রোতাদের মধ্যে এই ভাব আনন্দানুভাবে সঞ্চারিত হয়। এই গভীর অনুভূতিরই অন্য নাম 'রস'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উচ্চারণব্যঞ্জনাই হচ্ছে আবৃত্তির সার্থক ও অন্যতম গুণ। ব্যঞ্জনাই কবিতা, কবিতার প্রাণ। উচ্চারণব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য কবিতা বা কাব্যপংক্তির বাইরেও শব্দ সম্বন্ধে আবৃত্তিকারের গভীর অনুভব থাকা দরকার। তারপর সেই অনুভবকে অন্তরে গ্রহণ করে অনুশীলন করতে হবে নিজস্ব মাধ্যমে। বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের একটি নিবন্ধ 'স্বাভাবিক ও নির্মাণ' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক—

একজন লেখক এরকম বলেছিলেন—'মা' ডাকটি একাক্ষর, কিন্তু আর্তি তার ভুবনপ্লাবী। ঐ একাক্ষরের উচ্চারণের মধ্যে জড়িয়ে থাকে ভাবপ্রকাশের বহুমাত্রিকতা। কোলের ছেলে আচমকা পড়ে গেলে যেভাবে 'মা' বলে, খিদের কষ্টে সেভাবে 'মা' হাঁকে না। আবার তপ্ত জ্বরের রাত্রে শ্বাস ওঠা-নামার সময় ঐ অক্ষরটি যেভাবে উচ্চারিত হয়, বিস্ময়ে বা আনন্দে তারই বাগরীতি সম্পূর্ণ অন্য আদল নেয়।

এইরকম শব্দক্ষেপণের রীতিবদলের খেলাকেই উচ্চারণের অর্থ বা ভাবব্যঞ্জনা বলবো। তাই শুদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণ করলেই আবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় না। শুদ্ধ উচ্চারণের নামে কৃত্রিমতা এসে গেলে আবৃত্তি পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে বাধ্য।

উচ্চারণে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কলাকৌশলকে মেলাতে পারাটাই হল অনুশীলনের বিষয়।

অনুশীলনী

১। 'হ্যাঁ', 'না', 'সত্যি'—এই তিনটি শব্দের সাহায্যে নিচের ভাবগুলোকে উচ্চারণ ব্যঞ্জনার দ্বারা কণ্ঠের মাধ্যমে প্রকাশ করুন। বিস্ময়, ঘৃণা, যন্ত্রণা, উত্তেজনা, ব্যঙ্গ, বিরক্তি, সন্দেহ, ক্লান্তি আতঙ্কজনিত কম্পন, হতাশা, আনন্দ।

২। অনুশীলনের জন্য নিচে একটি কবিতা দেওয়া হলো। কোন শব্দটি কোন্ ভাব ও রসের প্রকাশ তা আপনার চিন্তা ও অনুসন্ধিৎকার সাহায্যে প্রকাশ করুন।

'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চিরআঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?'
হত্যায় খচিত এই ধরনীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
তাহারা কি জীব নহে?.....
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, নির্মল আকাশে—
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—'

(বিসর্জন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরিভাষা

১। **মৌলিক স্বরধ্বনি ঃ** যে স্বরধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদের মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। যথা— অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

২। **যৌগিক স্বরধ্বনি ঃ** একাধিক মৌলিক স্বরধ্বনি যুক্ত হয়ে যে স্বর গঠিত হয়, তাদের যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। মৌলিক স্বরধ্বনিগুলিকে পাশে রেখে এদের প্রকাশকরা যায়। যেমন—ওয়া (যাওয়া), এই (ঢেউ, কেউ) ইত্যাদি।

৩। **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ ঃ** ং, ঃ, ঁ—এরা অন্য বর্ণের সাহায্য বা আশ্রয় ছাড়া কখনই উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন—বরং, চাঁদ, দুঃখ ইত্যাদি।

৪। **শিস্ধ্বনি ঃ** শিস্ দেবার ধ্বনির সাথে এদের সাদৃশ্য দেখা যায় বলে একে শিস্ধ্বনি বলা হয়। যেমন—শ, ষ, স।

৫। **ঘোষ বর্ণ ঃ** বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে ধ্বনিগাম্ভীর্য (ঘোষ) থাকে বলে এদের ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ বলে। যথা— গ্ ঘ্ ঙ জ্ ঝ্ এ, দ্ ধ্ ন, ব্ ভ ম্।

৬। **অঘোষ বর্ণ ঃ** প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে। 'ঘোষ' শব্দের অর্থ গাম্ভীর্য, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ, অর্থাৎ ক্ খ, চ্ ছ্, ট্ ঠ্, ত্ থ্, প্ ফ্ গাম্ভীর্য বিহীন বলে এগুলো অঘোষ বর্ণ।

৭। **পার্শ্বিক ধ্বনি ঃ** (ল) ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকালে মুখ গহ্বরাস্থিত জিভের দু-পাশে বাতাস প্রবাহিত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

৮। **কম্পনজাত বর্ণ ঃ** (র) জিভের অগ্রভাগ কম্পিত করে, দন্তমূলে আঘাত করে উচ্চারিত হয়। এজন্য একে কম্পনজাত বর্ণ বলে। র-ফলার উচ্চারণ কঠিন, রেফের উচ্চারণ

শিথিল। র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যথা—বিক্রম. (বিক্‌ক্রম), নম্র (নম্‌ম্র) ইত্যাদি।

৯। **অধস্বর** ঃ য এবং ধ-কে অধস্বর বলে।

১০। **তরল স্বর** ঃ র ও ল-কে তরল স্বর বলে।

১১। **বর্ণদ্বিত্ব** ঃ শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করা হলে তাকে বলা হয় বর্ণদ্বিত্ব। যথা—কাচা-কাচ্চা, সবাই-সব্বাই ইত্যাদি।

১২। **বর্ণ বিপর্যয়** ঃ শব্দের মধ্যবর্তী বর্ণের স্থান পরিবর্তন করাকে বলা হয় বর্ণ বিপর্যয়। যেমন— রিক্‌শ-রিস্‌ক, বাক্স-বাস্ক ইত্যাদি।

১৩। **শ্বাসাঘাত** ঃ কথা বলার সময় বাক্যের মধ্যস্থিত শব্দের কোন নির্দিষ্ট অক্ষরের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, শ্বাসবায়ুর প্রাধান্যের ফলে একটি ঘটে। একে বলে শ্বাসাঘাত। বাংলা উচ্চারণে সাধারণত শব্দের প্রথম অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। যথা—প্রধান, স্বাধীনতা, নিরলস ইত্যানি।

১৪। **প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** ঃ বাংলা ভাষায় দুই বা ততোধিক শব্দ অর্থে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে একই বা প্রায় একরূপ হলে, সেগুলিকে সমোচ্চারিত শব্দ বলে। যেমন—কাশীতে গেলেই বারবার কাশি বাড়ে। এখানে 'কাশী' ও 'কাশি' শব্দ দুটি উচ্চারণ করলে একরকম শোনায় কিন্তু বানানের ও অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভেদ আছে।

১৫। **সমার্থক শব্দ** ঃ যে সব শব্দের উচ্চারণ ও বানান আলাদা আলাদা কিন্তু অর্থ একই, সেসব শব্দকে সমার্থক বা প্রতিশব্দ বলে। যেমন— 'ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।'

—এই স্তবকটির'জননী' ও 'ধাত্রী' শব্দ দুটির উচ্চারণ ও বানান আলাদা আলাদা। কিন্তু দুটি শব্দের অর্থ এক। এদের অর্থ মা।

৪

গদ্যপাঠ

আমরা আগে পাঠ ও আবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। জেনেছি পাঠ ও আবৃত্তির পার্থক্য। এবার গদ্যপাঠ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

সাহিত্যিকেরা যে ভাষা-রীতিকে অবলম্বন করে ভাষা সৃষ্টি করে থাকেন তাকেই বলা হয় 'গদ্য'। পৃথিবীর সব ভাষারাই আছে দুটি পৃথক্ রূপ, তার একটি হচ্ছে লেখ্য রূপ আর অন্যটি হচ্ছে কথ্য রূপ। বাংলা সাহিত্যের ভাষা দুই প্রকারের। এদের নাম 'সাধু ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'। সাধুভাষারই ক্রমবিকাশ চলিত ভাষা।

সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি। পক্ষান্তরে, চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি ও সমীকরণ ইত্যাদির কারণে তৎসম শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।

এগুলি সাধারণ পার্থক্য, কিন্তু তাছাড়া আছে আরও বহু পার্থক্য। যেমন সাধু ভাষার চাল গম্ভীর ভারিক্কী, চলিত ভাষায় চাল অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু সাধু ভাষার চেয়ে চলিত ভাষার গতি সাবলীল এবং সহজবোধ্য।

'সাধু ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'র রচনা পাঠকে শ্রোতাদের কাছে সুন্দর করে উপস্থিত করতে হলে ওদের পার্থক্য সম্বন্ধে জেনে রাখা দরকার। এই দুই ভাষার পার্থক্যের সব বিবরণ যে কোন ব্যাকরণ বইতে পাওয়া যাবে।

গদ্যাংশ পাঠকালে রচনার ভাষা সাধু কি চলিত তা স্থির করে, প্রথম থেকেই ভাষার ঐ বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্যিক তাঁর রচনার মাধ্যমে যা বলতে চেয়েছেন, জনসমক্ষে পাঠ করবার সময় পাঠককে সাহিত্যিকের মূল বক্তব্যটি সুন্দর করে তুলে ধরতে হবে। পাঠ করতে গেলে ভাবগত গাম্ভীর্য ও লঘুতা যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন ছন্দ, সুর, তাল, লয়, যতি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ।

এবার আমরা গদ্যপাঠ অনুশীলন শুরু করতে পারি। নিচের উদাহরণটিতে ছেদচিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল কোথায় প্রয়োজনমাফিক থামতে হবে।

॥ অনুশীলনের উদাহরণ ॥

১৯৭৬ সালের গ্রীষ্মকাল/একদিন/পদচিহ্ন গ্রামে/রৌদ্রের উত্তাপ/বড়ই প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়/কিন্তু লোক দেখি না/বাজারে/সারি সারি দোকান/হাটে/সারি সারি চালা/পল্লীতে পল্লীতে/শত শত/মৃন্ময় গৃহ/মধ্যে মধ্যে/উচ্চনীচ অট্টালিকা/আজ/ সব/নীরব/বাজারে/দোকানবন্ধ/দোকানদার/কোথায় পালাইয়াছে/ঠিকানা নাই/। আজ হাটবার,/ হাটে হাট লাগে নাই।/ ভিক্ষার দিন/ভিক্ষুকেরা/বাহির হয় নাই।/

তন্তুবায়/তাঁত/বন্ধ/ করিয়া/গৃহপ্রান্তে/পড়িয়া কাঁদিতেছে,/ব্যবসায়ী/ব্যবসা তুলিয়া/শিশু ক্রোড়ে করিয়া/কাঁদিতেছে/দাতারা/দান/বন্ধ করিয়াছে,/অধ্যাপকে/টোল/বন্ধ করিয়াছে, শিশুও/বুঝি আর/সাহস করিয়া/কাঁদে না।/ রাজপথে/লোক দেখি না,/ সরোবরে/ স্নাতক দেখি না,/গৃহদ্বারে/মনুষ্য দেখি না,/ বৃক্ষে/পক্ষী দেখি না,/গোচারণে/ গরু দেখি না,/কেবল শ্মশানে/শৃগাল-কুকুর।/এক বৃহৎ অট্টালিকা/তাহার/বড় বড় চুড়াওয়ালা থাম/দূর হইতে দেখা যায়/— সেই গৃহারণ্যমধ্যে/শৈল শিখরবৎ/শোভা পাইতেছিল।/ শোভাই বা কি,/তাহার দ্বার রুদ্ধ/, গৃহ/ মনুষ্যসমাগম-শূন্য/ ও শব্দহীন/বায়ু প্রবেশের পক্ষেও/বিঘ্নময়/তাহার অভ্যন্তরে/ ঘরের ভিতর/ মধ্যাহ্নে অন্ধকার/অন্ধকারে/নিশীথ ফুল্লকুসুম যুগলবৎ এক দম্পতি/ বসিয়া ভাবিতেছে।/ তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

(আনন্দমঠ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

॥অনুশীলনের জন্য উদাহরণ ॥

নিচের অংশগুলি পাঠের আগে যতিচিহ্ন বসিয়ে পাঠের উপযোগী করে আবেগ সঞ্চারিত সরব পাঠ করতে হবে।

(১)

নন্দিনী। সর্দার, সর্দার, ও কী! ও কারা!

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী। মানে কী।

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনো দিন ছিল?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায়?

সর্দার। বস্তুবাগীশ, পার তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম। (প্রস্থান)

নন্দিনী ওকী, ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্তি, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ় চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ঐ যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ার খেলায় সব্বার্‌ আগে পেত মালা। অনু-প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি তোমাদের নন্দিনী, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল, যে ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টুমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ঈশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি। এমন কেন হল।

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে দিকেটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লক্‌লক্‌ করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্ত্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐবড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

(রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(২)

ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টলমল করছে, কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিলমিলি করছে, গাছের পাতা

ঝিকমিক করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিকচিকিয়ে উঠছে—এই শরতের প্রভাত সংগীতে আমিই কেবল বোবা! আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ, আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না! আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্তির কেউ সহিতে পারবে কেন!

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই নবছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয়নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারিনে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো, বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে? হায় রে—

(ঘরের-বাইরে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩)

বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দিদি, শিউলিতলা গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিইচি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খণ্ড করে রেখেছিস?

দুর্গা শেখানোকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই। আহা, ভারীতো এখখানা বাঁকা-কঞ্চি, তোর মত পাগলামি—বাঁশ বাগান খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি? কঞ্চির ভারি অমিল কিনা!

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি। আমি কত খুঁজে পেতে নিয়ে আসবো, আর তুই সব ভেঙে চুরে রাখবি—বেশতো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো। এখন এনে যত চাস্, কান্না কিসের?

(পথের পাঁচালী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৪)

বহুদিন চলে গেছে। সে সন্ন্যাসিনীর আর খোঁজ পাইনি। তার কাছে পাপ স্বীকার করেছিলুম। সেই মুহূর্তে তার মুখখানি এমন জ্যোতির্ময় হয়ে জগতের চক্ষে ঢাকা নিষ্কলঙ্ক হল যে আমাকে মাথা নত করতে হয়েছিল। আমি? আমার মুক্তি নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। আছে তীব্র অনুতাপের জ্বালা, অন্তর্বিদ্রোহের বিভীষিকাময় উত্তাপ,

অশান্তির লেলিহান অগ্নিশিখা! তাই আজ এই আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়ায় দাঁড়িয়ে তোমাদের কাছে ভিক্ষা করছি,—ওগো দাও আজ একটু ক্ষমা, একটু স্নেহ তাই এই স্ফূর্তিহীন মহাযাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপ নিয়ে যাই। দুই চক্ষু আজ অন্ধ, বাত পক্ষাঘাতে আজ পঙ্গু, স্থবির বৃদ্ধাকে তোমরা পথ দেখাও,—ওগো প্রায়শ্চিত্তের উপায় বলে দাও। আজ দাও ঘোরতর পাপীর পায়ে ধরেও আমি বলছি—আমার চেয়ে পাপী জগতে নেই, ওগো, দাও একটু মার্জ্জনা, একটু মনের শান্তি।

(অনুতাপ—প্রবোধকুমার সান্যাল)

গদ্যপাঠের কৌশল

ওপরের অনুশীলনের জন্য গদ্যাংশগুলি দেওয়া হয়েছে তাতে ছেদ চিহ্ন এবং ভাব যতি বসিয়ে পাঠ সমাপ্ত করার আগে আমাদের আরো কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

আমরা জানি, সাহিত্যিকরা তাদের নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী ছেদ চিহ্ন বসিয়ে থাকেন, যেমন—দাঁড়ি (।), অবিচ্ছেদ (;), কমা (,), ড্যাশ (—), উদ্ধৃতিচিহ্ন (" "), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময় চিহ্ন (!) ইত্যাদি। সাহিত্যিকদের বসানো এই ছেদ চিহ্নগুলিকেই যুক্তিসম্মত ছেদ চিহ্ন বলা হয়। এই চিহ্নগুলি দিয়ে পাঠ করার সময় কোথায় কম থামতে হবে, কোথায় বেশিক্ষণ থামতে হবে তার একটি সূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু পাঠ করার সময় শ্রবণেন্দ্রিয়ে রম্যতা সৃষ্টি করতে গেলে শব্দের অর্থের বাইরেও একটা ভাব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে হয়। ফলে আরেক ধরনের ছেদ চিহ্ন বসাতে হয়, যার নাম মনস্তত্ত্বসম্মত ছেদ। এই ছেদ সব পাঠকরা যে একই জায়গায় বসাবেন এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পাঠকরা কোন ভাবটি প্রকাশ করতে চাইছেন তার উপর মনস্তত্ত্বসম্মত ছেদের ব্যবহার নির্ভর করে।

ছেদচিহ্নের পর আসে পর্বের কথা। গদ্যাংশের প্রতি লাইনে এক বা একের বেশি পর্ব থাকে। এই পর্বের ভাগটা কোন চিহ্ন দিয়ে দেখানো থাকে না, তবে আমরা পড়বার সময় নিজেদের অজান্তেই থেমে থেমে পড়ি। এই থামাকে বলে উচ্চারণের ছেদ বা অর্থযতি, অর্থযতি দ্বারাই গদ্যের পর্ব বিভাগের সৃষ্টি হয়। কবিতার পর্ব বিভাগ কিন্তু ছন্দযতিকে অনুসরণ করে করা হয়।

পাঠ করার সময় সব কটি পর্ব সমান গুরুত্ব পায় না। আবার বাঙলা উচ্চারণ রীতি অনুসারে পর্বের আদ্যক্ষরে একটা শ্বাসাঘাতে পড়ে। এই শ্বাসাঘাত উপেক্ষা করলে পাঠ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।

মনে রাখতে হবে পর্ব থেকে পর্বে ও বাক্য থেকে বাক্যে যাবার সময় স্বরের উত্থান-পতন, গতির বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপস্থাপনে গদ্যপাঠও উপভোগের বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

৫

অন্যান্য বাক্শিল্প

নাট্যকাব্য বা নাট্যকবিতা (Dramatic Poetry) ঃ বঙ্গসাহিত্যের আরো অনেক শিল্পশাখার মতো নাট্যকাব্যের পথিকৃত-এর সম্মানও রবীন্দ্রনাথের। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের রচয়িতা তিনি।

কাব্যনাটক ঃ কাব্যনাট্য হলো কাব্যাকারে নাটক, অর্থাৎ যা আকৃতিতে কাব্য, কিন্তু প্রকৃতিতে নাটক। এ জাতীয় নাটকে কাব্য ও নাট্যের সংমিশ্রণ ঘটে। সংলাপ আগাগোড়া কবিতায় রচিত হয় এবং কবিতার মাধ্যমেই নাটকের এ্যাক্শন গড়ে ওঠে।

কাব্যনাট্যের সংলাপ কাব্যধর্মী হলে, লক্ষ রাখতে হবে যাতে সংলাপের কাব্যিকতা নাটকের এ্যাক্শনকে ছাড়িয়ে না যায়, কাব্যরসই মুখ্য আস্বাদ্য হয়ে না ওঠে। নাট্যকাব্যের মূল আবেদন নিহিত থাকে কাব্যরসের মধ্যে।

কবিতার আবৃত্তি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, নাটকের আকারে পরিবেশিত কবিতার আবৃত্তিকে কাব্যনাটক বললেও তা অভিনয়ধর্মী অর্থাৎ কাব্যনাটক মাত্রেই অভিনয়। সুতরাং অভিনয় করার জন্য যে নাটকীয় আবেগ দরকার তা পুরোপুরি বজায় রাখতে হবে। তবে সে আবেগ ছন্দ ও যতির বন্ধনে বাঁধা থাকবে। কাব্যনাট্যের প্রয়োগের ব্যাপারে মঞ্চনাটকের মতো—আমার মনে হয় আবহ সঙ্গীত, শব্দ সংযোজন, দৃশ্যসজ্জা, আলোক সম্পাত ইত্যাদির সহযোগিতা গ্রহণ করলে কাব্যনাট্যও অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

কাব্যনাট্যের প্রসঙ্গ শেষ করা যাক বিশিষ্ট ইংরেজ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের বক্তব্য দিয়ে। (বাংলা ভাষান্তর শ্রী স্নেহাশিষ সুর, বাল্মীকি স্মরণ পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৪৮। ইংলন্ডের ন্যাশনাল বুক লীগের একাদশতম বার্ষিক বক্তৃতা সভায় ১৯৫৩ সালে ইলিয়ট যে বক্তৃতা দেন এবং পরে যা কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, শ্রীসুর তারই কিছু অংশ বাংলায় ভাবানুবাদ করেন)।

ইলিয়ট বলেছেন—'কবিতার প্রথম মাত্রা হলো কবিতার মাধ্যমে কবি নিজের সঙ্গে কথা বলা অথবা কারুর সঙ্গেই নয়। দ্বিতীয় মাত্রা হলো ছোটো বা বড়ো কোন শ্রোতৃমণ্ডলীকে কবিতার মাধ্যমে কিছু বলা। আর তৃতীয় মাত্রা হলো যখন কবি কোনো নাটকীয় চরিত্র তৈরি করতে চান যারা কথা বলবে কবিতায়—যে কথা কবির নিজের কথা নয়; এ কথা একটা কাল্পনিক নাটকীয় চরিত্র অন্য এক চরিত্রকে যা বলতে পারে। এই প্রথম ও দ্বিতীয়মাত্রার মধ্যে অর্থাৎ কবির নিজের সঙ্গে কথা বলা এবং অন্য

লোককে কবিতার মাধ্যমে কিছু বলা—এ দু'য়ের থেকেই শুরু হয় কাব্যিক সংযোগের ব্যাপারটা। আবার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ কবির নিজের কথায় অন্যকে কিছু বলা এবং একাধিক কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে অন্যকে কিছু বলা, এই দু'য়ের থেকে শুরু হয় নাটকীয়, আধা নাটকীয় এবং অ-নাটকীয় কবিতার।

........কাব্যনাট্যের সংলাপ হলো তৃতীয় মাত্রার কবিতা। একটা কাব্যনাট্যের অনেক চরিত্রের মুখে কথা যোগাতে হয় যাদের সংস্কৃতিগতভাবে একের সঙ্গে অপরের অনেক তফাৎ। এই বিশালসংখ্যক চরিত্রের সঙ্গে কবির মিশে যাওয়া সম্ভব নয় অথবা সকলকে একই ধরনের কিম্বা সকলকে বা একজনকে সব কবিতাই দেওয়া যায় না। এই কবিতা ভাগ করা আবার ভীষণভাবে চরিত্রানুগ হওয়া প্রয়োজন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে চরিত্ররা কিন্তু কবির মুখপাত্র নয়, তারা তাদের চরিত্রেরই রূপকার। সুতরাং চরিত্রের তারতম্যের কথা বিবেচনা করে কবির কিছু সীমারেখা থেকে যায় কাব্যনাট্যের সংলাপ প্রসঙ্গে। সংলাপের কবিতাগুলোকে আবার নাটকে পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। আবার, কোন কবিতা শুধু চরিত্রানুগ হলেই হয় না তাৎক্ষণিক এ্যাক্‌শনের সঙ্গেও মিলতে হয়।

"এই তৃতীয় মাত্রা কবিতা বা নাটকের সংলাপের কবিতার বৈশিষ্ট্য তখনই বেশি করে ধরা পড়ে যখন কোনো সাধারণ কবিতা যেখানে নাটকীয়তা আছে তার সঙ্গে এই নাটকের কবিতার তুলনা করা যায়।...........

আমি বলতে চাইছি (হয়তো পাঠকেরা এও ভাবতে শুরু করেছেন যে, প্রথম মাত্রার মতো আমিও বোধহয় নিজের সঙ্গেই কথা বলছি, কিন্তু তা নয়, আমি পাঠকদেরই বলছি) সেই এই তিনটি মাত্রার বিষয়টা পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করবেন কোনো কবিতা পড়ার অথবা কাব্যনাট্য দেখার সময়।..... আর তা যদি কাব্যনাট্য হয় তাহলে তাকে প্রাথমিকভাবে বিনোদনমূলক মাধ্যম হিসেবে নেওয়া উচিত।....."

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদায়-অভিশাপ'-এর অংশবিশেষ)

কচ ও দেবযানী

কচ। দেহো আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
কবিরে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্বাদ করো মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরু শিখরশিরে সূর্যের মতন,
অক্ষয় কিরণে।

দেবযানী। মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছো দুর্লভ বিদ্যা আচার্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি, আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখো মনে মনে।

কচ। আর কিছু নাহি

দেবযানী। কিছু নাই? আরবার দেখো চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান—অন্তরের প্রান্তে যদি
কোন বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র-দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁই
মোর মাঝে কোনো দৈন্য কোনো শূন্য নাই
সুলক্ষণে।

শ্রুতিনাটক ঃ শ্রুতিনাটক নামে বাক্‌শিল্পটি আধুনিককালের সৃষ্টি। শ্রুতিনাটক ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের এই অনুষ্ঠান দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছে। রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিই শ্রুতিনাটকের সার্থকতার একমাত্র উপজীব্য। এ-পর্যন্ত যে সব শ্রুতিনাটক মঞ্চায়িত হয়েছে তাদের অধিকাংশের বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সফল ছোটগল্প থেকে।

শ্রুতিনাটকের অভিনয়ে সময়ের ভূমিকাটি মোটেই নগণ্য নয়। সুদীর্ঘক্ষণ ব্যাপী এর অভিনয় শ্রোতা দর্শকদের বিরক্তির কারণ ও ক্লান্তিকর যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে এই বিশেষ নাট্যমাধ্যমটির অভিনয় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে একটু বেশি।

শ্রুতিনাটকের উপভোক্তা, দর্শক-শ্রোতাদের একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের প্রতি এর আবেদন। আর সেই ইন্দ্রিয়টি হল তাঁদের দুই কান। মূলত শ্রুতিনাটক শ্রুতিনির্ভর হলেও বক্তার ঠোঁট নাড়া, হাত, মুখ, মাথা নাড়া, ভ্রূ-ভঙ্গী, মুখের হাসি এসবই শ্রোতাকে সাহায্য করে।

শ্রুতিনির্ভর এই বিনোদন মাধ্যমটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করার খরচ স্বভাবতই বেশ কম। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মোট সংখ্যা ৪/৫ জন বা খুব বেশি হলে ৬/৭ জন। প্রত্যেকের কাছেই তাঁর নিজস্ব পঠিতব্য আগে থাকতেই কাগজে লেখা থাকে। শ্রুতিনাটকে অংশগ্রহণকারী কুশীলবরা তাঁদের নিজেদের বাড়িতে সময়-সুযোগ বুঝে

নিজের নিজের অংশ পাঠ করে পূর্ব-প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে। পূর্ণাঙ্গ একটি মঞ্চ নাটকের বেলায়, যেখানে রিহার্সেল—একটি প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে, কিন্তু শ্রুতি নাটকের ক্ষেত্রে শ্রুতিনাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা দু'একবার সমবেত হয়ে তথাকথিত 'রিহার্সেল'-এর কাজটি সেরে নিতে পারে। চরম মঞ্চায়নের দিন তাই তাঁদের কারোর মধ্যেই অপ্রস্তুতির আড়ষ্টতা থাকতে পারে না। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হলো এই নাট্যমাধ্যমটিতে প্রম্পটারের ও দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজন হয় না।

এই শিল্পমাধ্যমটি সম্বন্ধে অনেক সমালোচকই উন্নাসিক, তাঁরা এই শ্রুতিনাটকটিকে আদৌ স্বীকৃতি দিতে নারাজ। এক্ষেত্রে নানা মুনির নানান মত একদল বলে থাকেন, ভরত রচিত ঐতিহ্যপূর্ণ নাট্যশাস্ত্রের কোন বিভাগের সঙ্গেই এর কোন যোগ নেই। আবার আরেক দল বলেন, ঐতিহ্য এর আছে, এই নাট্যমাধ্যমটি যে মোটেই 'ভুঁইফোঁড়' —দুদিনের হুযুগের নয়, যদি আমরা পাশ্চাত্যের নাট্যশাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেখবো শেক্সপীয়ারের যুগে নাটক পাঠের রেওয়াজ ছিল। আবার আমাদের দেশে তো 'কথকতার' রেওয়াজ ছিল একসময় বা এখনও আছে। মহাভারত অনুবাদকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁর নিজগৃহের মধ্যেই নাটক পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাহলে, প্রশ্ন উঠতে পারে যেখানে চরিত্রগুলি দর্শকদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে অভিনয় করছে তাকে শ্রুতিনাট্য বলব কোন যুক্তিতে? সুতরাং, বর্তমান শ্রুতিনাট্য বা শ্রুতিনাটক বলে যা চালানো হচ্চে তাকে নাটকপাঠ অভিধায় অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

অভিনয় ঃ নাটকে বর্ণিত চরিত্রের হুবহু প্রতিফলন বা রূপদান করার নাম অভিনয়। নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি যেখানে যেরকমভাবে বর্ণিত হয়েছে, রঙ্গমঞ্চে চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বাচন ও হাবভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইত্যাদির মাধ্যমে অবিকল উপস্থিত করার নামই আঙ্গিক অভিনয়। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিনয়ে উচ্চারণশুদ্ধি, অর্থকরী ও ব্যঞ্জনাধর্মী স্বরপ্রক্ষেপণ কৌশল, সংযত আবেগ-সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর ইত্যাদির ব্যবহারজ্ঞানের উপর নজর রাখতে হবে।

বাচিক অভিনয় ঃ 'বাচা বিরচিত ঃ' কাব্যনাটকাদিষু বাচিক ঃ।। অর্থ হচ্ছে—কাব্যনাটকাদিতে বাক্যের দ্বারা বিরচিত যে অভিনয়কে ক্রিয়া প্রদর্শন, তাই বাচিক অভিনয়। বাচিক অভিনয়ে দুই বস্তু একান্ত অপরিহার্য। এর একটি কণ্ঠমাধুর্য ও অপরটি উচ্চারণ। এই দুটির সুষ্ঠু সম্মিলনে উৎপন্ন হয় মাধুর্যময় বাচিক অভিনয়।

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত'—নাটকের অংশবিশেষ)

চাণক্য ॥ চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত ॥ গুরুদেব!

চাণক্য॥ ঊর্দ্ধে চাও দেখি।—কি দেখছো?

চন্দ্রগুপ্ত॥ আকাশ।

চাণক্য॥ কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত॥ পাংশুরক্ত বর্ণ।

চাণক্য॥ কি বুঝছো?

চন্দ্রগুপ্ত॥ ঝড় উঠ্‌বে।

চাণক্য॥ ঠিক ঝড় উঠবে। আর সম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি। কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

চন্দ্রগুপ্ত॥ না।

চাণক্য॥অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে। এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবন নয়, পরশুরামের শৌর্য্য নয়, বামনের ছলনা নয়। এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি। স্বর্গমর্ত একসঙ্গে। আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত। ওঠো আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জানো?

চন্দ্রগুপ্ত॥ কি গুরুদেব!

চাণক্য॥ এই প্রধুমিতা প্রজ্জ্বলিতা প্রবাহিতা রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।

৬

ছন্দ

"অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টিরূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যেই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনই সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে-কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছন্দ সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্পন্দন। এই স্পন্দনই সৃষ্টি করে ছন্দের। এ বিশ্বচরাচর ধ্বনিময়। কিন্তু সব ধ্বনি আমাদের আলোচ্য ছন্দের ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি কেবল মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি। এ ধ্বনির আধার মানুষের ভাষা আর ভাষার গঠনমূলে রয়েছে শব্দ, ভাব, ধ্বনি প্রভৃতি নানা উপাদান। বস্তুতপক্ষে একটা কবিতা আবৃত্তির মূল ভিত্তি কী—স্বর ব্যবহারের জ্ঞান, ছন্দ না ভাব—এটা তর্কের বিষয়।

ছন্দ কবিতার অনেকখানি। বলতে পারি ছন্দই কবিতার প্রাণ। ছন্দের মূলকথা নিয়মিত যতিপাত। যতির প্রয়োগের মাধ্যমে ছন্দের স্পন্দন ও ধ্বনি-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের চরণের শেষে পড়ে যতি। চরণের অর্থ সম্পূর্ণতার দায়িত্ব ছন্দোযতি নেয় না। তবে ভাব যতি সে দায় বহন করে। নিচে ছন্দোযতি ও ভাবযতি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ছন্দোযতি ঃ ছন্দের প্রয়োজনে চরণের শেষে যে যতি পড়ে তাকে বলে ছন্দোযতি। ছন্দোযতিকে ☆☆ (স্টার) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যাক,—

(ক) আমার গায়ের ☆ মাটির গন্ধ ☆ এখানে আর ☆ নাই ☆ ☆ নাই সে বকুল ☆ পারুল — গাঁদা ☆ বাঁশীর সুরও ☆ নাই ☆ ☆

(খ) রূপশালি ☆ ধান বুঝি ☆ এই দেশে ☆ সৃষ্টি ☆ ☆ ধূপছায়া ☆ যার শাড়ি ☆ তার হাসি ☆ মিষ্টি ☆ ☆

ভাবযতি ঃ কবিতার চরণে ভাবের প্রয়োজনে যে বিরতি ঘটে তাকে ভাবযতি বলে। সুতরাং চরণের শেষেই যে ভাবযতি পড়বে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের ছন্দগুলিতে ভাবযতি ও ছন্দোযতি একই স্থানে পড়েছে। আবার আধুনিক যুগের গদ্যছন্দে ও অন্যান্য কিছু ছন্দেও ভাবযতি ও ছন্দোযতি পৃথক পৃথক স্থানে পড়েছে। ভাবযতিকে x x (ক্রশ) চিহ্ন দ্বারা, ☆ (স্টার) চিহ্নে ছন্দোযতিকে চিহ্নিত করে নিচে দু'একটি উদাহরণ দিলাম,—

(ক) নিশার স্বপনসম ☆ তোর এ বাবতা, ☆ ☆ রে দূত! x x অমরবৃন্দ ☆ যার ভুজবলে ☆ ☆ কাতর, ☆ সে ধনুর্ধরে ☆ রাঘব ভিখারী ☆ বাধিল সম্মুখে রণে? x ফুলদল দিয়া ☆ ☆ কাটিলা কি বিধাতা ☆ শাল্মলী তরুবরে ☆ ☆ x

উপরের উদাহরণটিতে প্রতি চরণের শেষে ছন্দোযতি পড়লেও ভাবযতি পড়েছে তিনটি স্থানে, এবং শেষের চরণের শেষে পাশাপাশি ছন্দোযতি ও ভাবযতি পড়েছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের বেলায় প্রায়ই ছন্দোযতি ও ভাবযতিকে একই স্থানে পড়তে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দেও দেখা যায় ভাবযতি ও ছন্দোযতি ভিন্ন স্থানে পড়েছে।

(খ) অনেকদিন সে ☆ চালতে তলা*

মাড়াই নি মা; xx ☆☆ আজকে তাই তো ☆ রৌদ্র ও'লা ☆ এই দিনটাতেই ☆ মনে পড়ে ☆ আর জন্মের ☆ স্মৃতির গন্ধ ☆ গুলো ☆☆x☆ ছড়িয়ে আছে ☆ উঠোন ভরে' ☆ চৈত্রে শিমুল ☆ তুলো। ☆☆☆ x x আমরা এখন চলো যাবো পর্ব কাকে বলে তাকে খুঁজতে।

গদ্যের প্রকৃতি বা লাইনের কোন মাপ নেই—এক এক লাইন এক-এক রকম হতে পারে। কিন্তু কবিতার লাইনগুলোর বা চরণগুলোর একটা নির্দিষ্ট মাপ থাকে। আবার গদ্যের লাইনে যতিগুলো থাকে অনিয়মিত; কিন্তু কবিতায় নিয়ন্ত্রিত। ছন্দোযতির দ্বারা চরণের একটি খণ্ডিত অংশ হলো পর্ব। গদ্যের মতো কবিতার ক্ষেত্রেও পর্ব ছোট বা বড় হতে পারে। যেমন—

(ক) মেঘলা দিনে / দুপুর বেলা / যেই পড়েছে / মনে
চিরকালীন / ভালোবাসার / বাঘ বেরুলো বনে।

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

(খ) লাল বাতির / নিষেধ ছিল, না, /
তবুও / ঝড়ের-বেগে—ধাবমান / কলকাতা শহর /

(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

উপরের প্রথম কবিতার দুটি লাইনে আমরা দেখতে পেলাম পর্বগুলো প্রায় সমান। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পর্ব কোথাও বড় আবার কোথাও ছোট। পর্বগুলোকে ভাগ করছে কে, না—যতি। যতিপাতের চলা এবং থামার নিয়মেই কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির মধ্যে তরঙ্গ ওঠে। সমুদ্রের ঢেউগুলোর মধ্যে যেমন ছোট-বড় নানা রকম তরঙ্গ দেখা যায়, ছন্দের যতি-ও উচ্চারিত বাক্যের মধ্যে এনে দেয় এমনি একটা দোলা বা গতি। ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে যতি অনেক গুরুত্বের। যেমন—

কে মেরেছে / কে ধরেছে / কে দিয়েছে / গাল
তাই তো খুকু / রাগ করেছে / ভাত খায়নি কাল।

এতক্ষণ যেসব কথা বললাম তাতে ছন্দ জিনিসটা কী—হয়তো পরিষ্কার হলো না। তাহলে একটু ব্যাখ্যা করে দেখা যাক। কবিতার ছন্দ কী—তা বলার আগে ছন্দ কথাটার মানে কী সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। ছন্দ হচ্ছে কানে শোনার জিনিস, চোখে দেখার জিনিস। পৃথিবীর যা-কিছু গতিময় তারই ছন্দ আছে। আমাদের চলায়, আমাদের বলায়, সব রকমের কাজে ছন্দ রয়েছে।

তিনটি দৃষ্টান্ত দিই : আমাদের পাশের বাড়ির বৃদ্ধ ব্যক্তির চলন মন্থর। এরও একটা ছন্দ আছে। এটা ধীর লয়ের ছন্দ। আবার একজন নর্তকীর নৃত্যের পদচারণা বা তরঙ্গের ওঠা পড়া। এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি মধ্যলয়ের ছন্দ। কোনো চঞ্চল বালকের লাফানো বা দৌড়ে চলা। এই তৃতীয় দৃষ্টান্তটি দ্রুত লয়ের ছন্দ।

এই তিন ধরনের লয় বাংলা কবিতার তিন ধরনের ছন্দের মধ্যে বিরাজিত। তবে গদ্য কবিতার লয় সাধারণ ধীর।

ছন্দশাস্ত্র বোঝার আগে এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ছড়িয়ে থাকা ছন্দ অনুভবের মাধ্যমে আবিষ্কার করতে হবে। সেই সঙ্গে অক্ষরের উপরে চোখ না রেখে ধ্বনির দিকে কান রাখতে হবে। ছন্দ—নির্ণয় ও মাত্রা নিরূপণ তাতেই নির্ভুল হবে। আবৃত্তি করার জন্য যেভাবে ছন্দ শেখার সুবিধে, সেভাবেই কবিতার ছন্দ জিনিসটা শেখার চেষ্টা চালানো যাক্।

আমরা সাধুভাষা কথ্যভাষার ছন্দকে আলাদা না করে বাংলা কবিতাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। (১) গদ্যছন্দে লেখা কবিতা, (২) পদ্যছন্দে লেখা কবিতা।

প্রথমেই পদ্যছন্দে লেখা কবিতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। কারণ ছন্দের দোলা এই পদ্যছন্দের কবিতাতেই বেশি।

এবার পদ্যছন্দে লেখা কবিতাকে আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেবো।

প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ ঃ

কিছু কিছু কবিতা ঘন ঘন তাল ঠুকে পড়া যায়। যেমন—

(ক) বদ্যিনাথের / সর্দি হলো / কলকাতাতে, / গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে / জোলাপ নিল / নস্যি নাকে / দিয়ে।

(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

(খ) আমি যদি / জন্ম নিতেম
কালিদাসের / কালে
বন্দী হতেম / না জানি কোন্
মালবিকার / জালে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই দুটি কবিতাংশের লয় দ্রুত, ঘন ঘন তাল ঠুকে পড়তে হয়। এই ছন্দরীতির নাম দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ ঃ

(ক) পঞ্চশরে / দগ্ধ করে / করেছ একী / সন্ন্যাসী
বিশ্বময় / দিয়েছ তারে / ছড়ায়ে

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(খ) হয়তো মেঘে / বৃষ্টিতে বা / শিউলি গাছের / তলে
আজানুকেশ / ভিজিয়ে নিচ্ছো / আকাশ-ছেঁচা / জলে

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

এই দুই কবিতাংশের লয় মধ্য, ঢেউ-এর ওঠানামা ধরনে পড়তে হয়। এই ছন্দরীতির নাম কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

তৃতীয় শ্রেণীর উদাহরণ ঃ

(ক) শাশুড়ী ননদী নাই / নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি / চক্ষু কৈলি রাতা॥

(কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম)

(খ) আমার বসন্ত কাঁদে / খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিন্দ্ররাতে / সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,

(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

এই দুই কবিতাংশের লয় ধীর, তানের প্রাবহ সৃষ্টি করে আবৃত্তি করতে হয়। এই ছন্দরীতির নাম মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ।

গদ্যছন্দ বা গদ্যকবিতার ছন্দ ঃ

গদ্যকবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে আবৃত্তিকারকে স্মরণে রাখতে হয় এই কথাটি যে, এর ছন্দ আগের আলোচনায় যে তিন রীতির কথা বলা হয়েছে তাদের ছন্দের মতন নয়। অর্থাৎ গদ্যকবিতার ছন্দে পর্ববিন্যাস সুপরিকল্পিতভাবে কালের নির্দিষ্ট ব্যবধানে নিয়মিতভাবে গঠিত হয় না। এক্ষেত্রে পর্বগুলি অর্থযতি দ্বারা বিভক্ত এক-একটি বাক্‌পর্ব। যেগুলি নিয়মিত দৈর্ঘ্যেরও হয় না। শুধু ছেদযতিকে অনুসরণ করে কবিতার অভিপ্রেত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এই ছন্দের লয় সাধারণত ধীর।। পদ্যছন্দ যদি হয় ঐক্যভিত্তিক, গদ্য-ছন্দ তাহলে বৈচিত্র্য-প্রধান। পদ্যছন্দে নির্দিষ্ট সংখ্যক পংক্তি নিয়ে স্তবক গঠিত হয়, গদ্যকবিতায় এমন কোন বিধি নেই। কেননা ভাবের অবাধ গতি গদ্যকবিতায় প্রধান। আর একথা তো সকলেই জানে যে গদ্যকবিতায় মিল থাকে না। যেমন—

উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে /
স্রষ্টা যখন / নিজের প্রতি অসন্তোষে /
নতুন সৃষ্টিকে / বারবার / করছিলেন বিধ্বস্ত, /
তাঁর সেই / অধৈর্যে / ঘন-ঘন / মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু /
প্রাচী ধরিত্রীর / বুকের থেকে /
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, / আফ্রিকা

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এহলো গদ্যকবিতার পর্ববিভাগ, অর্থযতি দ্বারা বিভক্ত। লয় অবশ্যই ধীর, এবং অন্তমিল নেই।

দল বা এবং মাত্রার সংজ্ঞা—বিশ্লেষণ ঃ

দল বা অক্ষর ঃ একটি শব্দের যে অংশটিকে আমরা একটানে বা এক-নিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি তাকে বাংলা ছন্দে বলা হয় দল বা অক্ষর।

অর্থাৎ শব্দকে উচ্চারণের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে যে শব্দাংশ পাওয়া যায় তাকেই বলে দল বা অক্ষর। যাকে ইংরাজীতে বলে syllable।

উদাহরণ—কখনও একদল বা এক অক্ষর যুক্ত শব্দ পাওয়া যায়। যেমন—ও, যে, চ, আয়, দায়, চল, জল, চাঁদ ইত্যাদি।

এছাড়া আছে একাধিক দলবিশিষ্ট শব্দ। যেমন—

মাতা = মা + তা = দুটি দল

রাজীব = রা + জীব = দুটি দল

স্বাগতা = স্বা + গ + তা = তিনটি দল

অন্ধকার = অন্ + ধ + কার = তিনটি দল

রবীন্দ্রনাথ = র + বীন + দ্র + নাথ = চারটি দল

দল বা অক্ষর দুই প্রকার। যথা— (১) মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর। (২) রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর।

(১) মুক্তদল ঃ যে দল বা অক্ষরগুলি স্বরবর্ণ দিয়ে শেষ হয় অর্থাৎ অন্তে স্বরধ্বনি যুক্ত সেগুলিকে বলা হয় মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল বলা হয় কেন? তার কারণ স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া মানে সেই দলকে যতক্ষণ ইচ্ছে টেনে দীর্ঘায়িত করা যায়)। যেমন— মা + আ + আ + আ।

উদাহরণ—উপরে 'মাতা' শব্দটির দুটি দলই মুক্ত। 'রাজীব' শব্দের প্রথমটি মুক্ত।

(২) রুদ্ধদল ঃ যে দল বা অক্ষরগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি দিয়ে শেষ হয় অর্থাৎ উচ্চারিত

হয় হসন্ত দিয়ে, তাদের বলে রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর। (রুদ্ধ কেন?—কারণ অক্ষর উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থেমে যেতে হয়, টেনে বাড়ানো যায় না।)

উদাহরণ—কান, তীর, দল, ভুল, চোখ সবই একাক্ষর রুদ্ধদল।

নির্বোধ = নির + বোধ = দুই রুদ্ধদল বিশিষ্ট শব্দ।

নন্দন = নন্ + দন্ = দুই রুদ্ধদল বিশিষ্ট শব্দ।

বক্রেশ্বর = বক্ + ক্রেশ্ শর্ = তিন রুদ্ধদল বিশিষ্ট শব্দ।

এছাড়া—ঐ, ঔ, এই— আই— আয় প্রভৃতি দলরুদ্ধ। একটি— কথা রুদ্ধদল কখনও শব্দের গোড়ায়, কখনও মাঝখানে, কখনও শেষে থাকে। যেগুলি শেষে থাকে তাদের বলে অন্ত্য হলন্ত অক্ষর। আর যেগুলি শব্দের গোড়ায় বা মাঝখানে থাকে তাদের বলে আভ্যন্তর হলন্ত অক্ষর বা মধ্যরুদ্ধ দল। যেমন—সংকীর্তন শব্দটির তিনটি দল, সং + কীর্ + তন্—তন একটি অন্ত্য হলন্ত অক্ষর। বাক্য দুটি সং ও কার আভ্যন্তর হলন্ত অক্ষর।

মাত্রা—মাত্রা মানে আদর্শ মান বা পরিমাপক। বাঙলা ছন্দে, মাত্রার সাহায্যে ছন্দের ধ্বনি-পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। মাত্রা ধ্বনিসূচক, কালসূচক নয়। ছন্দের কারবার ধ্বনি পরিমাণ নিয়ে, কালপরিমাণ নিয়ে নয়। কবিতা রচনার রীতিভেদে কোনো পর্বের মাত্রা 'দল' কোনো পর্বের মাতরা 'কলা'। এই দু'রকম মাত্রাকে বলা যায় যথাক্রমে দলমাত্রা ও কলামাত্রা। এইসব মাত্রার সাহায্যেই ছন্দের ধ্বনি পরিমাণ নির্ণীত হয়।

দলমাত্রা—দলকে যখন ছন্দের ধ্বনিমাত্রা বলে গণ্য করা হয়, তখন তাকে বলে দলমাত্রা।

কলামাত্রা—আর, কলাকে যখন ছন্দের ধ্বনিমাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কলামাত্রা।

দলমাত্রা দিয়ে দলবৃত্তরীতির ছন্দে রচিত কবিতার পংক্তির পর্ব পরিমাপ করা হয়। দলবৃত্তরীতির ছন্দে পর্বের অন্তর্গত শব্দের মুক্ত বা রুদ্ধ প্রত্যেকটি দলই একমাত্রা বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। যেমন—

ইচ্ছে করে / এই ব্যাটাদের / গোঁফ ধরে খুব / নাচি
মুখ্যু গুলোর / মুণ্ডু ধরে / কোদাল দিয়ে চাঁচি

ছন্দোলিপি করলে হবে—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ইচ ছে ক রে / এই ব্যা টা দের / গোঁফ ধ রে খুব / না চি
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
মুখ্ খু গু লোর/ মুন্ ডু ধ রে / কো দাল দি য়ে / চাঁ চি

মাত্রা—৪ + ৪ + ৪ + ২

কলামাত্রা দিয়ে কলাবৃত্তরীতির ছন্দোরচিত কবিতার পংক্তির পর্ব মাপা হয়। এই রীতির ছন্দের পর্বে অন্তর্গত শব্দের মুক্ত দল একমাত্রা আর রুদ্ধ দল দু'মাত্রা হিসেবে স্বীকৃত হয়। যেমন—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছো এ কী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে

ছন্দোলিপি করলে হবে—

২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১
পন্ চ শ রে / দগ্ ধ ক' রে / ক রে ছো এ কী / সন্ ন্যা সী
২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বিশ শ ময় / দি য়ে ছো তা রে / ছ ড়া য়ে

মাত্রা—৫ + ৫ + ৫ + ৪ + ৫ + ৫ + ৩

আর এক ধরনের কলাবৃত্তরীতির ছন্দে ধ্বনিবিন্যাসে ও মাত্রাগণনায় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই রীতির ছন্দে প্রতিটি মুক্তদল এক কলামাত্রা হিসেবে গণ্য। কিন্তু সব রুদ্ধদল দুই কলামাত্রার মূল্য পায় না। শব্দের শেষে অবস্থিত রুদ্ধদল দুই কলা পরিমিত হয় আর শব্দের সূচনায় বা মধ্যে অবস্থিত রুদ্ধদল এক কলামাত্রা হিসেবেই স্বীকৃত হয়।

এক্ষেত্রে, রুদ্ধদলের দুই ধরনের রূপের একত্র সমাবেশ ঘটেছে বলে এই রীতির নাম মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত। যেমন—

ইচ্ছার বন্ধন লও সে বন্দন ইন্দ্রজাল বলে
করে অলংকার।

ছন্দোলিপি করলে হবে—

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১
ইচ ছার বন্ ধন্ লও/ সে বন ধন ইন্ দ্র জাল ব লে /
১ ১ ১ ১ ২
ক রে অ লং কার

মাত্রা—৮ + ১০
৬

মুক্তক ছন্দ—এ কোনো ছন্দরীতি নয়। এ এক ধরনের ছন্দোরূপ, যা তিনরীতির ছন্দে নির্মাণ করা যায়। এর রূপটা হোলো, কবিতার পংক্তিগুলি অসম দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ প্রতি পংক্তিতে পর্বের সংখ্যা সমান নয়। যার জন্যে এই রূপবন্ধে ২ মাত্রার পর্ব পংক্তি যেমন লেখা যায়, তেমনি ২০ / ২২ মাত্রার পর্বও লেখা যায়। ভাবযতি আর

ছন্দোযতির একত্রে অবস্থান এক্ষেত্রে থাকে না। পংক্তি মিল থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। ভাব বাধাহীনভাবে বিহার করতে পারে। স্তবক বন্ধনেরও কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

উদাহরণ ঃ—

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত মুক্তক ছন্দ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে আছে। যেমন—

মুক্তি, এবার / মুক্তি আজি	৪ + ৪
উঠল বাজি /	০ + ৪
অনাদরের / কঠিন ঘায়ে /	৪ + ৪
অপমানের / ঢাকে ঢোলে / সকল নজর / সকল গাঁয়ে	৪ + ৪ + ৪ + ৪

প্রতিটি পূর্ণপর্ব চার মাত্রার। কোনো পংক্তিতে একটি, কোনোটিতে দু'টি, কোনোটাতে চারটি পর্ব রয়েছে। পর্বের সংখ্যা অসমান, পংক্তির দৈর্ঘ্যও অসম। অপূর্ণ পর্ব নেই। থাকলেও কিছু এসে যেতো না।

কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত মুক্তক ছন্দ— রবীন্দ্রনাথের মহুয়া, শ্যামলী সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন—

ঝরিয়া পড়ে / পাতা	৫ + ২
বনস্পতি / তবুও তুলি / মাথা	৫ + ৫ + ২
নিঠুর তপে / মন্ত্র জপে / নীরব অনি / মেষে	৫ + ৫ + ৫ + ২
দহনজয়ী / সন্ন্যাসীর / বেশে	৫ + ৫ + ২

এবার মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত মুক্তক ছন্দ—
(যাকে 'বলাকা'র ছন্দ বলা হয়)—

হে ভুবন /	+ ৪
আমি যতক্ষণ /	+ ৬
তোমারে না বেসেছিনু ভালো— /	১০ +
ততক্ষণ তব আলো /	৮ +
খুঁজে খুঁজে পাই নাই / তার সব ধন	৮ + ৬

তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কবিতার পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য অসমান অর্থাৎ পর্বের সংখ্যা সমান নয়।

'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের পর এ এক বৈপ্লবিক ছন্দোমুক্তির নিদর্শন।

কবিতা সংকলন

প্রথম পর্যায় ঃ অনুশীলনের জন্য

এই পর্যায়টিকে আবৃত্তি অনুশীলনের 'প্রথম ভাগ' বলা যেতে পারে। একজন অনুশীলনকারীর আবৃত্তিচর্চা করতে গেলে প্রাথমিক ভাবে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা উচিত, ঠিক সেই ভাবেই এই পর্যায়ের কবিতাগুলি পর পর সাজিয়ে দেওয়া হলো।

প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির ছন্দোরীতি, লয়, পর্ব বিভাগ ইত্যাদি ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলাম না। ছোটরা যাতে সহজভাবে নিজেনিজেই কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে পারে, তার জন্য রীতি—লয়ের পর্বের তত্ত্বকথা দিয়ে তাদের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ন হতে দিলাম না।

আশা করবো, আবৃত্তিচর্চায় যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', কাজী নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা' এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সুকান্ত সমগ্র'—এই তিনখানি বই অবশ্যই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' থেকে 'তালগাছ', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'লুকোচুরি', 'আষাঢ়', 'খেলা-ভোলা', 'মামলা', 'সোনার তরী', 'দুই পাখি', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'শঙ্খ', 'দুঃসময়', 'ভারততীর্থ' ইত্যাদি কবিতা; কাজী নজরুল ইসলামের 'লিচু চোর', 'দেশলাই কাঠি', 'আমরা এসেছি' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রথম পর্যায়ে অনুশীলনের জন্য রাখা হলো।

ছড়া—প্রাচীন

(১)

খুকু যাবে / শ্বশুরবাড়ি, /
সঙ্গে যাবে / কে?
বাড়িতে আছে / হুলো বেড়াল,/
কোমর বেঁধে / ছে /
আম কাঁঠালের / বাগান দেবো, /
ছায়ায় ছায়ায় / যেতে,
শান্ বাঁধানো / ঘাট দেবো, /
পথে জল / খেতে /

ঝাড় লণ্ঠন / জ্বেলে দেবো, /
আলোয় আলোয় / যেতে,
উড়কি ধানের / মুড়কি দেবো, /
শাশুড়ি ভো / লাতে

(২)

আঁটুল বাঁটুল / শামলা সাঁটুল
সামলা গেছে / হাটে,
সামলাদের / মেয়েগুলো /
পথে বসে / কাঁদে
আর কেঁদোনা / আর কেঁদোনা /
ছোলা ভাজা / দেবো,
এবার যদি / কাঁদো তবে,
তুলে আছাড় / দেবো।

(৩)

ইকড়ি মিক্‌ড়ি, চাম চিক্‌ড়ি,
চাম কাটে মজুমদার,
ধেয়ে এল দামোদর,
দামোদর ছুতোরের পো
হিঙুলগাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়্মড়্!
দাদা দিলে জগন্নাথ
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি
চাল কাঁড়তে হ'ল বেলা
ভাত খাও সে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি!
কোদাল হ'ল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথালি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি
থর থর করি কাঁপিছে ভূদর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।

হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের গাধন,
লহরির 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠছে পরাণ
কিসের আধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু—আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি।
.শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥
কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাতে কর্॥
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর॥

* কলাবৃত্ত রীতি, মধ্যলয়।

ছড়া / জসীমউদ্দীন

শিকে নড়ে, শিকে নড়ে,
তার উপরে পায়রা উড়ে
আয় পায়রা, নাম এসে
লাফা বেগুনটা ধর হেসে।
লাফা বেগুন না দুটো মুলো,
ধান বের করে কুলো কুলো।
যে দিবে কুলার আগে
তারে খাবে জংলা বাঘে।
যে দিবে ভরা কাঠা,
তার হবে সাত বেটা।
সাত বেটা আঠার নাতি,
বুড়োর কাঁধে ধবল ছাতি।
ধবল ছাতি আন রে
সোনার পা রূপার বালা,

ঘরখানা বড় দেখতে ভালা।
ঘরখানা বড় আঁটুনি,
গিন্নী বড় কাটুনি।
কেন গিন্নী বিরস মন,
আমায় দেবে কত ধন?
দাও ধন চলিয়া যাই
আর বাড়ি—ত পেতে' চাই।
আর বাড়ি মথুরাপুর
আসতে যেতে সমুদ্দুর।

প্রভাতী / নজরুল ইসলাম

ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে
যূঁই-শাখে
ফুল-খুকী ছোট রে!
খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ঐ "রামা হৈ!"
ত্যাজি' নীড়
ক'রে ভীড়
ওড়ে পাখী আকাশে,
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে!
চুল্‌বুল্‌

বুল্‌বুল্‌
শিশ্‌ দেয় পুষ্পে,
এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে!
খুলি' হাল
তুলি' পাল
ঐ তরী চল্‌লো,
এইবার
এইবার
খুকু চোখ খুল্‌লো!
আল্‌সে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে!
উঠ্‌ল
ছুট্‌ল
ঐ খোকাখুকী সব,
"উঠেছে
আগে কে"
ঐ শোনো কলরব!
নাই রাত,
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয় গানে
ভগবানে
তুষি' বর মাগো রে!

একুশে আইন / সুকুমার রায়

শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে,
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার॥
সেথায় সন্ধে ছটার আগে,
হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে—
হাঁচ্‌লে পরে বিন্‌ টিকিটে—
দম্‌দমাদম্‌ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে॥
কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্‌স চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার॥
চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক ওদিক্‌ ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায়।
যে সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্‌ সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা॥

হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অম্‌নি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলনে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে।

গোঁফ চুরি / সুকুমার রায়

হেড্ অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্‌ত?
দিব্যি ছিলেন খোস্‌মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে!
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্‌টি ক'রে গোল
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল"!
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক কর্‌ছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, 'ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি।"!
গোঁফ হারান! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়াত তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সাম্‌নে ধ'রে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।"
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
এমন গোঁফ ত রাখ্‌ত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।"
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস কর্‌ব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।

ছায়াবাজি / সুকুমার রায়

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জানোনা বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেকরকম পুঁজি।
শিশির ভেজা গদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুরবেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পান্‌সে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এ-সব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছু পিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভূঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো,
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে এদিক-ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়্‌গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্‌ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোরে ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দি কাশি থাকবে না আর কারো।
আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়,

ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলায় তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ একেবারে দিশি—
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

নিঃস্বার্থ / সুকুমার রায়

গোপালটা কি হিংসুটে মা! খাবার দিলাম ভাগ করে,
বল্লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যেঠাইমা যে মেঠাই দিলেন, 'দুই ভায়েতে খাও বলে'—
দশটি ছিলো, একটি তাহার চাখতে দিলেম ফাও বলে,
আর যে নটি, ভাগ করে তায় তিনটে দিলেম গোপালকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, কাঁদিস কেন? তুই যে নেহাৎ কনিষ্ঠ,
বয়স বুঝে, সামলে খাবি, তা নৈলে হয় অনিষ্ঠ।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুনতি তাই,
মোদ্দা আমার ছয় খানি হয়, তিন বছরে, তিনটি পাই।"
তাও মানে না কেবল কাঁদে,—স্বার্থপরের শয়তানি,
শেষটা আমার মেঠাইগুলো খেতেই হলো সবখানি।

বুঝিয়ে বলা / সুকুমার রায়

ও শ্যামাদাস! আয় তো দেখি বোস তো দেখি এখানে,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেবো পাঁচ মিনিটে, দেখে নে।
জ্বর হয়েছে? মিথ্যে কথা! ও-সব তোদের চালাকি—
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলি, শুনতে পাইনি? কালা কি?
মামার ব্যামো? বদ্যি ডাকবি? ডাকিস না হয় বিকালে;
না হয় আমি বাৎলে দেবো বাঁচবে মামা কি খেলে!
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবোই বোঝাবো—
না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাবো।

কোন্ কথাটা? তাও ভুলেছিস? ছেড়ে দিছিস হাওয়াতে?
কি বলছিলেম পরশু রাতে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে?
ভুলিস নি তো বেশ করেছিস, আবার শুনলে ক্ষতি কি?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস, মাড়াস্ নে যে এদিকই!
বলছি দাঁড়া, ব্যস্ত কেন? বইগুলো আন নামিয়ে—
তুই থাকতে মুটের বোঝা বইতে যাবো আমি এ?
সাবধানে আন্, ধরছি দাঁড়া—সেই আমাকেই ঘামালি,
এই খেয়েছে! কোন্ আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি?
ঢের হয়েছে! আয় দেখি তুই বোস তো দেখি এদিকে—
ওরে গোপাল গোটা কয়েক পান দিতে বল্ খেঁদিকে।

দেশলাই কাঠি / সুকান্ত ভট্টাচার্য

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি না ঃ
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস;
অমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেধেছিল?
ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—
আমাকে অবজ্ঞাভরে না-নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায়!
কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে,
কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ ;
আমি একাই—ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি।

এমনি বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে।
তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের?
মনে নেই? এই সেদিন—
আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে ;
চমকে উঠেছিলে—
আমরা শুনেছিলাম তোমার বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ!

আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছে বারংবার ;
তবু কেন বোঝো না,
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা তো তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা তো জানো না ঃ
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই—শেষ বারের মতো!

*গদ্যকবিতা, ধীরলয়।

গাধা পিটিয়ে মানুষ / বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়

বুঝেছি এই সার কথাটি মানুষ করা সহজ নয়—
গাধা ধরে পিটিয়ে গেলেই সব গাধা কি মানুষ হয়!
ত্যাঁদড় গাধা, বাঁদর গাধা, পুঁচকে দামড়া গাধায় সব
বইয়ের পাতা দেখলে কেন চিবোয় তখন গবাৎ গব।
কানটি ধরে গাধার তখন শুধাও যদি, হচ্ছে কি?
অমনি গাধা গান জুড়ে দেয় চাঁহা আহা চিঁ হি হি।
বেয়াদপির রাজা এখন; ভালো কথায় হয় না কাজ,
ভালর সঙ্গে মন্দ মেশায়, সব গিয়েছে লজ্জা লাজ।
তাই বলে যে গাধাগুলো গাধাই থাকুক চিরকাল
এসব কথা বলব কেন, পরের মুখে খাই না ঝাল।
আসলে যা সার বুঝেছি সেই কথাটি বলছি ভাই
যন্ত্রযুগে যন্ত্র বিনা হবার কিছু জো-টি-নাই।
'যন্ত্রমানব' নাম শোন নি? 'মানব যন্ত্র' এবার চাই
কচি কাঁচা মগজগুলো যন্ত্রে ঢেলে নাও রে ভাই।
শিশি বোতল ছাঁচে ঢেলে গড়ছে লোকে দেখছ না
তেমনি এবার বানাও দেখি শিক্ষা ছাঁচের কারখানা।

তারপরেতে গাধা ধরে ছাঁচের মধ্যে দাও ঢেলে।
দশ মিনিটেই স্টুপিড গাধা মানুষ করে নাও চেলে।
এমনি ভাবে সাচ্চা লোকে দেশটা যদি গড়তে চাও
গুরুগিরির তত্ত্ব ভুলে মানুষ গড়ার ছাঁচ বানাও।

চোরের আত্মকথা / অন্নদাশঙ্কর রায়

চোর বলে, ভাই, ডাকাতের উৎপাতে
রাজধানীতেও রাস্তায় চলা দায়
বোমা ছুঁড়ে মারে গাড়িতে ও ফুটপাতে
বুলেট চালায় ব্যাঙ্ক পিয়নের গায়

মানুষকে যদি বলি দিতে হয়, দাদা,
আমাদের মতো অহিংস মতে মারো
চালের সঙ্গে মেশাও কাঁকর শাদা
ফাঁসির হুকুম হবেনা এক জনারো!

তেলের সঙ্গে মেশাও শেয়ালে কাঁটা
হোক বেরিবেরি কোলাব্যাঙ গম ফোলা
তেঁতুলবীচির সঙ্গে মেশাও আটা
পেট ছেড়ে যাক, যমের দুয়ার খোলা।

মানুষ মারার কৌশল জানি নানা
শুধু ভয় পাই চীনেদের দশা দেখে
এ মহাবিদ্যা ওদেরো তো ছিলো জানা
তবু ওরা কেন ভাগে রাজধানী থেকে!

বলো দেখি এই এতো বড়ো ভুঁড়ি নিয়ে
কোথায় পালাই কোন ফরমোজা দ্বীপে?
স্বপ্নের মাঝে কেঁদে উঠি ডুকরিয়ে
ওরা যে আমায় তাড়া করে আসে জীপে।

চোরের সঙ্গে ডাকাতের সংগ্রামে
গান্ধীর নাম কোনই কাজের নয়
হাত জোড় করি মার্কিনজীর নামে
আণবিক বোমা, তোমারি কেউ হয়।

শহর ছেড়ে আইলাম / শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আড়ি আড়ি আড়ি
যাব গ্রামের বাড়ি
গ্রামের বাড়ি ফলতায়
থাকব না এই গলতায়
শহর শহর কাদের ধন
শহর গেছেন বৃন্দাবন
শহরে ট্রাম-বাসের সার
গ্রাম পড়েছে পুকুর পাড়
পুকুরপাড়ের খেজুর গাছে
তাকধিনাধিন বাবুই নাচে
ওরে বাবুই নাচবি আয়
উঠোনে আর খড়-বাতায়
সরষে দেব ঢেলে
নাচবি না কেউ এলে
গাইবি না গান, লক্ষ্মী—
তুই না বাবুই পক্ষী!
একলা একা শুনব গান
বাবুই পাখি, কোথায় যান
শহর ছেড়ে আইলাম
তোর কাছে কী পাইলাম?

রাজা আর সেপাই / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল,
রাজা বললেন, সেলাম!
সেপাই বলল, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম?
রাজা বললেন, রামো রামো
বিড়ি তো নয়, মুলো!

সেপাই বলল, গোঁফের ডগায়
জমছে কেন ধুলো?
রাজা বললেন, কমলা— আপেল
আনব কয়েক ঝুড়ি?
সেপাই বলল, কোথায় আমার
পেঁয়াজ—লঙ্কা—মুড়ি?
রাজা বললেন, বসুন আগে,
এই যে সিংহাসন,
সেপাই বলল, নোংরা ওটা
মাছিতে ভন্‌ভন্‌!
রাজা বললেন, মাছি কোথায়,
ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বলল, কাজে-কম্মে
দিচ্ছ খুবই ফাঁকি।
রাজা বললেন, নাচার হুজুর
দেখছি পা তুলে,
কত বড় ফোস্কা, আমার
জুতো দিন-না খুলে!

ছড়া লেখার ছড়া / কবীর সুর চৌধুরী

একটি ছড়া একশ দু' মাইল
একটি ছড়া দু' ইঞ্চি
আর এক ছড়ার নাগাল পেতে
আনতে হবে ঘরাঞ্চী।
লিখব ছড়া মোটকা এমন
হাতীর সাথে পাল্লা দি'
অন্যটি ভাই তেমনি রোগা
ছিঁচকাঁদুনে আহ্লাদী।
অষ্টবক্র আর ছড়াটি
সৃষ্টিছাড়া অর্থহীন
লিখতে সেটা কাটলো বছর
নিদ্রাবিহীন রাত্রিদিন॥

দ্বিতীয় পর্যায়

অনুশীলনের প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে যেসব শিক্ষার্থী পরবর্তী স্তরে অনুপ্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়-এর কবিতাগুলি সংকলন করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়-এর মুখবন্ধে বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', কাজী নজরুলের 'সঞ্চিতা' এবং সুকান্তের 'সুকান্ত-সমগ্র'—এই তিনখানি বই আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের সব সময় নিজের কাছে রাখতে হবে। এই তিন কবির বেশ কিছু কবিতার (যা সাধারণত আবৃত্তি করা হয়) নাম, ছন্দোরীতি ও লয় নিচে উল্লেখ করে দেওয়া হলো ঃ—

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

	কবিতার নাম	ছন্দোরীতি	লয়
১।	নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	কলাবৃত্ত	মধ্য
২।	বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	দলবৃত্ত	দ্রুত
৩।	সোনার তরী	কলাবৃত্ত	মধ্য
৪।	সুপ্তোত্থিতা	কলাবৃত্ত	মধ্য
৫।	পরশ পাথর	মিশ্রবৃত্ত	ধীর
৬।	দুই পাখি	কলাবৃত্ত	মধ্য
৭।	ঝুলন	কলাবৃত্ত	মধ্য
৮।	ব্রাহ্মণ	মিশ্রবৃত্ত	ধীর
৯।	১৪০০ সাল	মুক্তক, মিশ্রবৃত্ত	ধীর
১০।	দুঃসময়	কলাবৃত্ত	মধ্য
১১।	ঝড়ের দিনে	মিশ্রবৃত্ত	ধীর
১২।	দেবতার গ্রাস	প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত	ধীর
১৩।	জন্মান্তর	দলবৃত্ত	দ্রুত
১৪।	এক গাঁয়	দলবৃত্ত	দ্রুত
১৫।	সুপ্রভাত	কলাবৃত্ত	মধ্য
১৬।	আগমন	দলবৃত্ত	দ্রুত
১৭।	কৃপণ	দলবৃত্ত	দ্রুত
১৮।	শঙ্খ	দলবৃত্ত	দ্রুত
১৯।	ঝড়ের খেয়া	মুক্তক মিশ্রবৃত্ত	ধীর
২০।	নিষ্কৃতি	মুক্তক দলবৃত্ত	দ্রুত

২১।	সাগরিকা	মুক্তক কলাবৃত্ত	মধ্য
২২।	বাঁশি	মুক্তক মিশ্রবৃত্ত	ধীর
২৩।	সাধারণ মেয়ে	গদ্যকবিতা	ধীর
২৪।	হঠাৎ দেখা	গদ্যকবিতা	ধীর
২৫।	আফ্রিকা	গদ্যকবিতা	ধীর

নজরুল-এর কবিতা

	কবিতার নাম	ছন্দোরীতি	লয়
১।	বিদ্রোহী	মুক্তক কলাবৃত্ত	মধ্য
২।	আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে	মুক্তক দলবৃত্ত	দ্রুত
৩।	ফরিয়াদ	কলাবৃত্ত	মধ্য
৪।	আমার কৈফিয়ত	কলাবৃত্ত	মধ্য
৫।	সব্যসাচী	কলাবৃত্ত	মধ্য
৬।	দারিদ্র	প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত	ধীর
৭।	রাজভিখারি	কলাবৃত্ত	মধ্য
৮।	জীবন বন্দনা	কলাবৃত্ত	মধ্য

সুকান্তর কবিতা

	কবিতার নাম	ছন্দোরীতি	লয়
১।	ছাড়পত্র	মুক্তক মিশ্রবৃত্ত	ধীর
২।	একটি মোরগের কাহিনী	গদ্যকবিতা	ধীর
৩।	ঠিকানা	কলাবৃত্ত	মধ্য
৪।	দেশলাই কাঠি	গদ্যকবিতা	ধীর
৫।	ঐতিহাসিক	গদ্যকবিতা	ধীর
৬।	বোধন	কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত ও গদ্যকবিতার সমন্বিত রূপ	মধ্য ও ধীর
৭।	রানার	মুক্তক কলাবৃত্ত	মধ্য
৮।	প্রিয়তমাসু	গদ্যকবিতা	ধীর
৯।	আমরা এসেছি	কলাবৃত্ত	মধ্য
১০।	দুর্মর	কলাবৃত্ত	মধ্য

মাথুর / বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নারি ওর।
ও ভরা বাদর মাহ্ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর
ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
আথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙয়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

* প্রত্নকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়—মধ্য

পূর্বরাগ / চণ্ডীদাস

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান তারা
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

* এ-ও প্রাচীনকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়-মধ্য

কৌলীন্য / ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা আঁটি।
এ যে কুল কুল নয় বার মাত্র আঁঠি॥
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে॥
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা॥
আদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় রুচি॥
অতএব বৃথা এই কুলের আচার॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একেক মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার॥
নরনারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে॥
ব্যাভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে॥
কুলকল্পে নয় রূপ সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য তাহা॥
নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন করিব ধারণ॥
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার॥

* পয়ার এখন যাকে বলা হয় মিশ্রবৃত্ত।

বঙ্গভাষা / মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায় মন ঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরে ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মনিজালে।

* 'অমিত্রাক্ষর' বা বিশেষ মিলযুক্ত প্রবহমান পয়ার, মিশ্রবৃত্ত রীতির মধ্যেই পড়ে। লয়-ধীর।

১৪০০ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান;
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে?

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণদ্বার
বসি বাতায়ণে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
একদিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে
নবীন ফাগুনদিন সকল-বন্ধন হীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা
দক্ষিণসমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শতবর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে,
কবি এক জাগে—
কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শতবর্ষ আগে॥

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥

* মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক রূপ, ধীর লয়।

মাধবিকা / যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দখিন হাওয়া—রঙিন হাওয়া, নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী।
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আসছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির শন্‌শনানির গান ধরি';
মৌমাছিদের মনভুলানি গুন্‌গুনানির সুর ধরে'—
চললে কোথায় মুগ্ধ পথিক, পথটি বেয়ে উত্তরে?

লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' বক্ষ আঁকি' চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন্ প্রিয়ারে বাঁধতে ভুজবন্ধনে?
অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো!
—তেম্‌নি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেমনি গলার হাঁকটি সেই,
দেখতে পেলেই চিনতে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই!
—কোথায় কুঞ্জ-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে!
লক্‌লকে সেই বেতসবীথির বলো তো ভাই কোন্ গলি,
এলা-লতার কেয়াপাতার খবর তো সব মঙ্গলই?

—ভালো, কথা, দেখলে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,—
বন্ধু বলে' চিনতে পারো হয়নি তো ভাই সন্দেহ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্‌নি তো সব ভুল করে—
তেম্‌নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!
আসতে যেতে দীঘির পথে তেম্‌নি নারীর ছল করা /
পথিকবধূর চোখের কোণে তেম্‌নি তো সেই জলভরা?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল-লেখা মন্তরে
আজও তো সেই আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নখক্ষতের চিহ্ন কার,
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্বরাতের ছিন্নহার!
রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুটছে তো,
শাখার তরি দুলতে দোলায় তরুণীদল জুটছে তো?
তোমায় দেখে' তেম্‌নি ডেকে উঠছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীর্ষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ?

—তেমনি—সবই তেম্‌নি আছে! হ'লাম শুনে' খুব খুশী
প্রাণটা ওঠে চন্‌চনিয়ে মনটা ওঠে উস্‌খুসি'!
নূতন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি',—
বন্ধু, তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছলিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো, গ্রহণ করো—বন্ধু আমার দণ্ডেকের—
জানি নাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের॥

* দলবৃত্ত রীতির ছন্দ। চার মাত্রার পর্ব। লয়-দ্রুত।

বঙ্গজননী / সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস বিরস মুখে?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায় বুকে!
ঢল্‌ ঢল্‌ নয়ন-যুগল জল ভরে প'ড়ছে ঢুলে,
কালো মেঘ মিলিয়ে গেলো তোর ওই নিবিড় কালো চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধুলা আছে চুমি'?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি?
মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্নসুধা বঙ্গে ফেরে গরল হয়ে সর্বনেশে,
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে চেয়ে,
অন্ন বসন বিহনে হায় মরে তোমার ছেলেমেয়ে!
বল মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্গবে না কি?
ধন্য হতে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি?
ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস মা আবার তেমনি হাসি!
চরণ তলে সপ্তকোটি সন্তান তোর মাগোরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে;
সোনার কাঠি রূপার কাটি ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্তি ধরো—শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি।

* দলবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়-দ্রুত।

রাজ-ভিখারী / নজরুল ইসলাম

কোন্ ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে উঠেছিলে জাগি'
ওগো চির-বৈরাগী।
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি'—
ওগো চির-বৈরাগী।
ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি',
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' ব'লে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি'—
ওগো চির-বৈরাগী।
আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে'
মোহ ঘুমপরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে'।
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী,
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধুলায় বেদনার দাগে দাগী।
কে গো নারায়ণ নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী—
ওগো চির-বৈরাগী।
'দেহি ভবতি ভিক্ষাম্' বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার পেলেনা ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।
বলিলে, 'দেবেনা? লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।'—
দিল না ভিক্ষা, নিলনাক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী।
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি'।

* কলাবৃত্ত রীতি, মধ্যলয়।

বাংলার মুখ / জীবনানন্দ দাশ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে—
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ

জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বথের করে আছে চুপ
ফনিমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমন হিজল-বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

* মিশ্রবৃত্ত রীতি, লয়-ধীর।

উটপাখী / সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধুধু করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,

সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদ্ প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো।
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলবে না লোহার চিড়িয়াখানা;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,
শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজবো না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাবে না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়া জুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু জনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করছে আগে,
আমাদের' পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধিঃ
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি॥

* কলাবৃত্ত রীতি, মধ্যলয়।

সংগতি / অমিয় চক্রবর্তী

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
অকালে আগুনে তৃষ্ণার মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয়-কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধন, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।

জীবন, জীবন—মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গী হারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন সে নানা রঙ তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি,
তার সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ীর চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা স'রে যায় তারা শুধু—লোকগুলো;

কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা।
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

কলাবৃত্ত রীতি। মধ্যলয়।

পল্লী জননী / জসীমুদ্দীন

রাত থম্ থম্ নিঝুম, ঘোর-ঘোর আন্ধার,
নিশ্বাস ফেলি, তাও শোনা যায়, নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দ্বীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।

ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুঁড়ে ঘর বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।

ছেলে কয়, "মারে, কত রাত আছে? কখন সকাল হবে,
ভাল যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে?"
মা কয় বাছারে! "চুপটি করিয়া ঘুমা ত একটি বার,"
ছেলে রেগে কয় "ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার?"
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা, সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।

নমাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভাল কোরে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।

ভাল কোরে দাও আল্লা রছুল! ভাল কোরে দাও পীর।
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর!

বাঁশবনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
বুদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।
চলে বুনোপথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাকন ধরি,
দুর ছাই! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই, বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয়, "মাগো! পায়ে পড়ি বলো ভাল যদি হই কাল,
করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে না ত তুমি গাল?
আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া
এখনি আমারে এত রোগ হতে করিতে পারে ত খাড়া?"
মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে,
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
"শোন মা! আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি শিকা পরে।
খেজুরে-গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে,
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।"
ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোয় থম্থম কাল রাত।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হোয়ে গেল আসেনাকো আই-ঢাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে?
কত কথা আজ মনে পড়ে মার, গরীবের ঘর তার,
ছোট খাট কত বায়না ছেলেরে পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে আমরা মুসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম যে গেল? রহিম চলিল? এমনি প্রশ্ন-মালা;

উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।
ঘরের চালেতে ভুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এলো বুঝি হায়! হাঁকে মায়, দূর-দূর।
পচা ডোবা হতে বিরহিনী ডা'ক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি,
কৃষাণ ছেলেরা কাল্‌কে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফেরে ভন্‌ ভন্‌ মশা দলে দলে বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল গড়াইছে তার সনে।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা;
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহা-কাল-রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল,
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

* কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়-মধ্য।

আমার পরান মুখর হয়েছে / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে,
প্রভঞ্জনের প্রতি পদপাতে আমার পরান দোলে।
আমার পরানে ভাই,

কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।
সূর্যের বুকে কী ভুখ জাগিছে আমার পরান জানে,
কীটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে।
আমার পরানে ভরা

এ পথচারিনী বসুন্ধরার অকারণ ঘুরে—মরা।
বনানী-বীণায় মর্মরি ওটে আমার ব্যাকুল প্রাণ,
আমার পরান তৃণের সভাতে হয়েছে শ্যামায়মান।
আমার পরানে শিহরিছে প্রতি পুষ্পের ঝিলমিল্‌,
আমার পরান নিঙাড়ি নিভাড়ি আকাশ হয়েছে নীল।
রহেনি কোথাও ফাঁক,

আমার পরানে জমেছে বিশ্ব—বেদনার মৌচাক।
দীর্ঘশ্বাসের দরিয়া দুলিছে, মরুভূর শূন্যতা,
অন্ধকারের কাতর কাকুতি, ঝরা মুকুলের ব্যথা—
আমার পরান ভরি
মুর্ছিত আছে যুগান্তরের মৃত্যুর বিভাবরী।

কলাবৃত্ত রীতি, মধ্যলয়।

কথা / প্রেমেন্দ্র মিত্র

তারপরও কথা থাকে;
বৃষ্টি হয়ে গেল পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন
আবছায়া মেঘ-মেঘ কথা;
কে জানে তা কথা কিংবা
কেঁপে-ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।
সে-কথা হবে না বলা তাকে;
শুধু প্রাণধারণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে ফাঁকে
অবাক হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা-একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।
অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে।
হৃদয়ের কতটুকু মানে।
তবু সে—কথায় ধরে!

তুষারের মতো যায় ঝ'রে
সব কথা কোন এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের।
হাত দিয়ে হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।

সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়,
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়।

তাপরর জীবনের ফাটলে—ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।

* রীতি—মিশ্রবৃত্ত, লয়—ধীর।

চিল্কায় সকাল / বুদ্ধদেব বসু

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।
কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠেছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলা!—কি ভালো তোমাকে বাসি,
কেমনে ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি?

রুপোলি জলে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীল স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।—এখানে জ্বলে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে

জলের উপর দিয়ে। কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো।
তোমার নীল এই আকাশ। — আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন করে' বলি।

* গদ্য কবিতা, ধীর লয়।

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ / বিষ্ণু দে

তুমি কি কেবলি স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি?
হরেক উৎসবে যত হৈহয়-সঙেঘর
মঞ্চে মঞ্চে কেবলি কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?
কাল বৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা
বাদলের প্রবল প্লাবন
সবি শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ?
অপঠিত, নির্মনন নেই আর কোন আবেদন?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্র খর বিভা
আমাদের দুস্থ চিরগোধূলিতে ম্রিয়মাণ?
তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিত্যরুচি ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর?
কোথা সে প্রতিদিন রূপের রচনা
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ
নিরলস জ্ঞানের নিয়ম
কঠিন শিক্ষার শ্রম
বৃদ্ধির নির্ভর শুভ্র আলোকে আলোকে
আত্মস্থের স্তব্ধতায় শুদ্ধ অন্ধকারে
শূন্য শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীপ্ত গীতে
চৈতন্যের জ্যোতিষ্কে জ্যোৎস্নায়?

উদ্ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন,
যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ
সন্ধ্যারাগে ঝিলমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার
নটীরনূপুরে বাজে নদীর জোয়ার
শিহরণ দেওয়ার বন।
তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পোকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ—
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে
আমাদের বিকারের গড্ডলধূলায় দিনগত অন্যায়ে কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান
দেখি যেন একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ুর প্রগতির এক ছবি
সুন্দরের গান যেন শুনি গাই
দশটা-পাঁচটার উদ্ভ্রান্ত ট্রাফিকে
বস্তিতে বাসায় আর বাংলার নয়া কলোনিতে
জীবিকার জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে
বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনী মাইকে অসুস্থ বৈভবে
মরাখেতে কারখানার পড়ি যে জীবনের
সংগ্রাম শান্তির স্পষ্ট উপন্যাস
খুঁজি যেন সকালের সূর্য থেকে সন্ধ্যার সূর্যের
শুনি যেন আমাদের কান্নার অতলতলে অমর ভৈরবী
প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে
সহজ অভ্যাস ফেলে সকাল-সন্ধ্যায় বারোমাস
বছরে বছরে গড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস
তোমার বসন্ত গানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে
আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফুলে

ভ্রমর গুঞ্জনে নব মর্মরের
গড়ে তুলি আজকাল শতবর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি।

* মুক্তক বা মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়-ধীর।

পারিবারিক / ঝাক্ প্রেভের

অনুবাদ—অরুন মিত্র

মা করেন উলের জামা
ছেলে করে যুদ্ধ
সেটা খুব স্বাভাবিক মনে করেন মা
আর বাবা কি করেন বাবা?
তিনি করেন ব্যবসা
তাঁর স্ত্রী করেন উলের জামা
তাঁর ছেলে যুদ্ধ
তিনি ব্যবসা
সেটা খুব স্বাভাবিক মনে করেন বাবা
আর ছেলে সেই ছেলে
কী মনে করে সেই ছেলে?
সে কিছুই মনে করে না কিছুই না সেই ছেলে
তার মা করেন উলের জামা বাবা ব্যবসা সে যুদ্ধ
সে যখন যুদ্ধ শেষ করবে
তখন ব্যবসা করবে বাবার সংগে
যুদ্ধ টিকে থাকে মা টিকে থাকেনা উল বোনেন
বাবা টিকে থাকেন ব্যবসা করেন
ছেলে মারা পড়ে সে আর টিঁকে থাকে না
বাবা আর মা যান গোরস্থানে
সেটা তাঁরা খুব স্বাভাবিক মনে করেন বাবা আর মা
জীবন টিকে থাকে জীবন উলের জামা যুদ্ধ ব্যবসার সঙ্গে
ব্যবসা যুদ্ধ উলের জামা যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা আর ব্যবসা
গোরস্থানের সংগে জীবন।

* গদ্য কবিতা, ধীর লয়।

খোকা, ফিরে আয় / দিনেশ দাশ

মা বলেন, খোকা ফিরে আয়!
হঠাৎ সজোরে মাথা ঠুকে যায়,
সকল সময় আমি বাধা চাই নিয়ে কচি-কাঁচা
ফিরে আয় বাছা!

জানিস্ আমার বড় ভয় করে—সর্বদাই ভয়,
পৃথিবী এখন দেখি গরুর সিঙের মতো
তেড়ে আসে সকল সময় ঃ
দরজা জানালা খাট ঘরের দেওয়াল
মাতালের মতো টলে, ধাক্কা দিয়ে
ফেলে দেয় সকাল বিকাল ঃ
ফিরে আয় বাছা,
আবার জীবন পাক এ বাড়ির খাঁচা,
আবার উঠুক কলকলি—
পাখির কাকলী।

ছেলে বলে, মা আমি ফিরব না তো
তোমার শহরতলীর রাজ্যপাটে,
এখানে আমি যে ছুটি রেসের ঘোড়ার মতো কলকাতার মাঠে,
সূর্যের সারথি হাতে অজস্র চাবুক অবিরাম,
আমার মসৃণ ত্বকে অবিরত ঝরে রক্ত ঘাম ঃ
তাই বলি, আমার পায়ের চাপে হবে ছত্রাকার
তোমার তাসের সংসার

মা আমার, আমি আর ফিরতেই পারি না,
তোমার দুধের বাটি আর আমি চুমুক দেবোনা মুখ ভরে,
সে দুধ উপুড় করে ঢেলে দিও
তুলসী মঞ্চের কোলে শিলার ওপরে ঃ
পেয়েছি অনেক আমি, খেয়েছি অনেক—ঢের,
একটি মাছের পেটি দিও ছোটদের॥

মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক রূপ। লয়-ধীর।

আত্মরতি / পরমানন্দ সরস্বতী

কার চোখে যে কান্না ঝরে
কোথায় জ্বলে আগুন,
হঠাৎ ধরে কার মনে ক্ষয়
—ভীষণ রোগের ঘূণ,
কে কার খবর রাখে?
স্বার্থ-কাদার শীতল প্রলেপ
যে যার গায় মাখে।

মৌমাছি-সুখ চাক বাঁধে দূর
শূন্য আশার ডালে,
কঠিন দিনের দাহে পড়ে
চাকের মধু গলে—
মাটির হাঁড়ি কখন ভাঙে
হয়না মধু চাখা,
ধূধূ করে মস্ত বড়
হাঁ-করা এক ফাঁকা।

ভাঙা-হাঁড়ির
কে-ই বা খবর রাখে?
চতুর মন কেবল ঘোরে
সুখের বাঁকে বাঁকে।
সুখের মুখ যায় না দেখা
সোনার দর্পণে,
সোনা-রূপা আগুন জ্বালে
আগুন জ্বালে মনে।

সবাই মরে বয়ে ভূতের বোঝা
কে কার খবর রাখে?
স্বার্থ-কাদার শীতল প্রলেপ
যে যার গায়ে মাখে॥

দলবৃত্ত রীতি, দ্রুত-লয়।

মহুয়ার দেশ / সমর সেন

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে-ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দু-ধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে-মাঝে শুনি
মহুয়া-বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

একটি মোরগের কাহিনী / সুকান্ত ভট্টাচার্য

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ম চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা;
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল

ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার
ময়লা ছেঁড়ে ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের!

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে॥

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

মেজাজ / সুভাষ মুখোপাধ্যায়

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড়বিড় করে মালা জপছেন
বউ
গটগট গটগট করে হেঁটে গেল

আওয়াজটা বেয়াড়া; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ করে নতুন কেনা হয়েছে।

সুতরাং
মালাটা থেমে গেল; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেই দিকে ঢলে পড়ল।
নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।
বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচ্‌ড়ে আঁচ্‌ড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।
ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ করে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিন্‌সের আক্কেলও বলিহারি!

কোত্থেকে এক কালো অলক্ষণে
পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে ঘরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—

হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা
মরবার জন্যে বিষ্ খেয়েছিল।
ভাসুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ করে মরলে কী হয়?
ঢণ্ডী আর বলছে কাকে!

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট করে সামনে দিয়ে চলে গেল।

নাঃ, আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা'—
'বলুন।'
উহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায় দেওয়ার মত নয়
বড্ড ন্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি?
বাড়িটার যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে;
ফরসা ফরসা মেয়ে
বউ্রি র মত ভূশুণ্ডি কালো নয়।

বালতি ঠনঠনিয়ে
বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিণী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন ঃ আচ্ছা থাক, এখন যাও।
বউ মাথা উঁচু করে
গটগট গটগট করে চলে গেল।

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে বসে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল—
বউ বলছে ঃ 'একটা সুখবর আছে!'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা; মা কান খাড়া করলেন
বলছে ঃ 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে ঃ
'কী' নাম দেব, জানো?
আফ্রিকা
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে'॥

* গদ্য কবিতা।

নক্সীকাঁথার কাহিনী / মনীন্দ্র রায়

সামনে তার হারিকেন চিমনিভাঙা কালিতে আচ্ছন্ন,
শীতের সন্ধ্যায় ফের সরঞ্জাম নিয়ে বসল মেয়ে।
ছেঁড়া কাপড়ের ফালি, বাতিল সেমিজ টুকিটাকি—
আর দেরি নয়,

পৌষে না হোক মাঘে সে আসবেই, সময় আসন্ন;
দ্রুত চলে হাত, চলে লাল নীল সুতো, নক্সা ওঠে;
মুখে তার আলো পড়ে, চারিদিক ছায়া-ছায়া, আর
মন স্বপ্নময়।

উঠোনে নিমের চারা, ঈষৎ হাওয়ায় পাতা কাঁপে,
পোষা কুকুরের ছানা কুণ্ডলী পাকিয়ে বারান্দায়,
এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে এলোমেলো কথা ভেসে আসে,
চাপা অন্ধকার।

এ সময়ে মন যেন বুকের খাঁচায় মাথা কোটে,
ঝাপটিয়ে দুখানি ডানা খোঁজে মুক্ত স্মৃতির আকাশ—
হায়রে কোথায় সেই হারানো সংসার, কতো দূরে
নীল পদ্মাপার।

তবু শোক নয়, দুঃখ অশ্রু মোছে আপন উত্তাপে।
(যেখানে আদর নেই, অভিমান কে করে নির্বোধ।)
লাজুক গাঁয়ের মেয়ে, নির্ঝরের গুহা ভেঙে সেও
নেমেছে প্রান্তরে।

স্বামীকে পাঠায় রোজ ফুটপাতের দোকান আগলাতে,
তিন বাড়ি কাজ সেরে গা-গতরে ক্লান্তি ব'য়ে নিজে
দিনান্তে স্বপ্নকে তার বাঁধে রাঙা জুতোর নক্সায়
কাঁথার উপরে।

কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশি তার চেয়ে?
কে সয়েছে এত গ্লানি রাণাঘাটে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পথে,
উড়িষ্যার তেপান্তরে জনহীন দ্বীপান্তরে আর
হাওড়ার স্টেশানে?

অচল পয়সার মতো পরিত্যক্ত, তবু বার বার
কে এমন ফিরে আসে, ঘর বাঁধে, কার এত আশা?
দারিদ্র্যের কাঁটাগাছে দুরন্ত স্বপ্নের রাঙাফুল
ফোটাতে কে জানে!

সন্ধ্যায় লণ্ঠন জ্বেলে বসে তাই বারান্দায় মেয়ে।
নিভে গেছে দিন তার, ক্ষয়ে যায় রাত্রির বিশ্রাম,
সেলায়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে যন্ত্রণা ও স্বপ্ন তবু যেন
স্বর্গে তোলে মাথা!

পৌষে না হোক মাঘে যে আসবে সে নবজাতকের
ধুলিশয্যা ঢেকে দিতে পৃথিবীর মতো ধৈর্যময়ী
সুতীব্র ইচ্ছায় বিঁধে আদিগন্ত শস্যের মাটিতে
রচে নক্সীকাঁথা॥

মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়-ধীর।

রাজা আসে যায় / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
দিন বদলায় না।
গোটা পৃথিবীকে গিলে খেতে চায়
সেই যে ন্যাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার
লড়াই চলছে, চলবে,
পেটের ভিতর কবে যে আগুন
জ্বলছে এখনো জ্বলবে।
রাজা আসে যায়
আসে আর যায়
শুধু পোষাকের রং বদলায়
শুধু মুখোশের ঢং বদলায়

দিন বদলায় না
পাগলা মেহের আলি
দুই হাতে দিয়ে তালি
এই রাস্তায়   ওই রাস্তায়
এই নাচে (আর) ওই গান গায়
সব ঝুট্ হায়! সব ঝুট্ হায়
ঝুট হায় সব ঝুট্ হায়
জননী জন্মভূমি
সব দেখে সব শুনেও অন্ধ তুমি
সব জেনে সব বুঝেও অন্ধ তুমি
তোমার ন্যাংটো ছেলেটা কবে যে
হয়েছে মেহের আলি
কুকুরের ভাত কেড়ে খায়—দেয়
কুকুরকে হাততালি
তুমি বদলাও না
সেও বদলায় না।
শুধু পোষাকের
রং বদলায়
শুধু পোষাকের
ঢং বদলায় দিন বদলায় না।

* কলাবৃত্ত রীতি, মধ্য লয়।

জননী যন্ত্রণা / মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জন্মে মুখে কান্না দিলে ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল—ওকূল কালিঢালা কাল নাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডুবাল দিন ঢেউয়ের ছেলে খেলা
সামনে যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা-হা-হা-হা,
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা-টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখের অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্চ্ছা বোন ঃ ডাঙা।

ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মতো এক কোণে বউ, দুয়ারে তার ছা—
হাসতে জানেনা বাছা কান্না জানে না।

এক সে ছেলে, জোয়ান ছেলে কইসে-ছেলে মা।
ঘর যে তোমার ঘরে ঘরে, জননী যন্ত্রণা॥

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
এ-কূল ও-কূল দু'কূল-মজা কালনাগিনীর দ'য়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলা ফেলা
ভয়কে দিলাম ভরাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও—কার নৌকো, আলো
নেই—মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায়?
সেই আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কে ভালো।
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ—বা কলে কারখানায়।
একটি তারা পিদিম কখন হাজার তারা জ্বালে ঃ
এক ছেলে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা।
একটি আশা অনেক মুখের পাপড়িতে মুখ মেলে ঃ
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম সে একজনা।

ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

দলবৃত্ত রীতি, দ্রুত লয়।

উলঙ্গ রাজা / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে ঃ শাবাশ, শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার প্রবঞ্চক;

কেউ ভাবছে রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।
গল্পটা সবাই জানে
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশ্রস্তি বাক্য—উচ্চারণ কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না
একটা শিশুও ছিল,
সত্যবাদী, সরল সাহসী একটি শিশু,
নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছিনা।
শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পথের ঘাস মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়
যাও তাকে যেমন করে হোক
খুঁজে আনো
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক :
রাজা তোর কাপড় কোথায়?

* গদ্যকবিতা। ধীর লয়।

শূন্য পুরাণ / জগন্নাথ চক্রবর্তী

একটা শূন্যকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে গেছি
সামান্য একটা শূন্যকে ভরাতে পারছি না

সানাইওলাকে দিয়ে নহবৎ বাজালাম
উপচে পড়া রাগিনী শূন্যের পরিধি একটু ছুঁয়ে গেল
কিন্তু শূন্যকে ভরাতে পারল না।

কী করি! আচ্ছা, বাঁয়ে একের পর এক
সংখ্যা লিখে গেলে কেমন হয়?
দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি—
কী বিরাট এক সংখ্যা!
যেন এক দর্পিত সাম্রাজ্যের বাজেট!
মনে হচ্ছে, এবার শূন্যকে খুব জব্দ করা গেছে,
যেন বড়ো ক'রেই তার পায়ে বেড়ি দিয়েছি।
এই সংখ্যার সমুদ্র থেকে ক্রমে বেরিয়ে এলো
আকাশ ছোঁয়া বাড়ি সমুদ্রকর্ষী জাহাজ
গঞ্জ দুর্গ মন্দির রঙ্গমঞ্চ
কিন্তু কী সর্বনাশ!
প্রত্যেকের মধ্যেই অসংখ্য ফাঁক
আরো অসংখ্য শূন্য
যেন ছলনার মধ্যে ছলনা।
নাঃ! এবার কলমের এক আঁচড়ে
বাঁদিকের সংখ্যাগুলো সব ছেঁটে ফেলে
আবার সেই আদিম শূন্যটার মুখোমুখি হলাম।

এবার শূন্যের ডাইনে একের পর এক
সংখ্যা লিখে ফেললে ত মন্দ হয় না!
দশমিক শতমিক সহস্রমিক—
সংখ্যাটা ছোট হ'তে হ'তে একেবারে
অণুবীক্ষণের রেঞ্জ পেরিয়ে যাচ্ছে
বাঃ! বেশ ত!
এবার শূন্যকে খুব সরু বোতলে ভ'রে জব্দ করা গেছে

এই ভেবে বেশ তৃপ্তি হচ্ছিল,
কিন্তু হঠাৎ এক প্রচণ্ড শব্দে
তৃপ্তির বোতল ভেঙে চুরমার,
অদৃশ্য প্রায় সংখ্যার মতো অদৃশ্যতার শূন্যটা
পারমাণবিক বিস্ফোরণে গর্জে উঠল—
দেখি, সংখ্যার শরশয্যায়
পিতামহ শূন্য শুয়ে আছেন—
তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না।
একটা শূন্যকে নিয়ে খুবই বিপদে প'ড়ে গেছি।

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

কে ডাকে / কৃষ্ণ ধর

হঠাৎ চারিদিকে শব্দ গমগমিয়ে ওঠে
মাথার ওপর আকাশ তার প্রতিধ্বনি ছড়ায়
মনের ভিতরে তাকে খুঁজি,
এইবার চলো, আর দেরি নেই।

পরস্পরের দিকে তাকাই
কারো মুখে কোন কথা নেই
সবাই যেন বোবা পাথর।
মনের ভিতরে সেই প্রতিধ্বনি অনবরত খেলা করে,
এইবার চলো, আর দেরি নেই।

যারা এতক্ষণে দাঁড়িয়েছিল ওরাও জানে না,
যারা ঘরমুখো তারাও না,
শুধু মনের ভিতরে সেই ডাক,
এইবার চলো, আর দেরি নেই।

রোজই সেই শব্দ শুনি
রোজই মনের ভিতরে প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে
আমাদের রক্তের অন্তর্গত নদী
আমাদের স্বপ্নের অন্তর্গত নদী
আমাদের স্বপ্নের অন্তর্গত সমুদ্র
আমাদের সময় আর সময়হীনতা

সকলকে সাক্ষী রেখে বুকের মধ্যে সেই শব্দ
বাজতে থাকে,
এইবার চলো, আর দেরি নেই।

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

স্বাধীনতা তুমি / শ্যামসুর রহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাদের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের বাড়ির কাঁপন।

স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহিদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকুর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

* মুক্তক কলাবৃত্ত মধ্য লয়।

ভিখিরির আবার পছন্দ / শঙ্খ ঘোষ

থাক্ সে পুরোনা কাসুন্দি
যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক
যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
ভাঙবার শুধু সময় চাই।

ভাঙবার শুধু সময় চাই
এরাস্তা থেকে ও রাস্তায়
হবো ক'দিনের বাসিন্দা
কে না জানে সব অনিত্য

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড় কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ

ভিখিরি আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাবে যে কোন ঠাঁই

আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে

কেটে যাবে দিন আনন্দে
ভাসমান সব বাসিন্দার
জীবন তো একই কাসুন্দি
ভিখিরির আবার পছন্দ।

* কলাবৃত্ত রীতি, ধীর লয়।

সোনার মেডেল / পূর্ণেন্দু পত্রী

বাবুমশাইরা
গা—গেরাম থেকে ধূলোমাটি ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে
আপনাদের কাছে এসেছি।
কি চাক চিকান শহর বানিয়েছেন গো বাবুরা।
রোদ কেউটের গা থেকে খসে পড়া
রূপোর তৈরী একখানা লম্বা খোলস।
মনের উনোনে ভাতের হাঁড়ি হাঁ হয়ে আছে খিদেয়
চাল ডাল তরিতরকারি শাকপাতা কিছু নেই
কিন্তু জল ফুটছে টগবগিয়ে।

বাবুমশাহরা,
লোকে বলেছিল, ভালুকের নাচ দেখালে
আপনারা নাকি পয়সা দেন।
যখন যেমন বললেন, নেচে নেচে হদ্দ।
পয়সা দিবেন নি?
লোকে বলেছিলো ভানুমতীর খেল দেখালে
আপনারা নাকি সোনার ম্যাডেল দেন।
নিজের করাতে নিজেকে দুখানা করে
আবার জুড়ে দেখালুম,
আকাশ থেকে সোনালি পাখির ডিম পেড়ে
আপনাদের ভেজে খাওয়ালুম গরম ওমলেট
বাঁজা গাছে বানিয়ে দিলুম ফুলের ঘুঙুর।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

বাবুমশাইরা
সেই ল্যাংটো বেলা থেকে বড় শখ
ঘরে ফিরবো বুকে সোনার ম্যাডেল টাঙিয়ে।
আর বৌ-বাচ্চাদের মুখে
ফাটা কাপাস তুলোর হাসি ফুটিয়ে বলবো—
দেখিস। আমি মারা গেলে
আমার গা থেকে গজাবে
চন্দনগন্ধের বন।
সোনার ম্যাডেল দিবেন নি?

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

পরশুরাম / শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো
আমার পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই
মুখের ওপর এঁটে নেব মুখোশ
হাতে নেব টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে,
আমার নিজেরই রক্ত
প্রথম দিনে ওকে আমার নিজের রক্ত খাইয়েছি
দিয়েছি রক্তের স্বাদ, করে তুলেছি হিংস্র সিংহ যেন

ওস্তাদ ওঁরা ঠিক যেমন যেমন বলেছিলো
আমি ওকে তেমনি ধীরে ধীরে করে তুলেছি জাগ্রত
বিষাক্ত, পোষমানা অথচ নির্ঘাত!
ওকে শীতে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়েছি রোজ
গা মুছে দিচ্ছি সিঁদুর পরিয়ে
শোয়াচ্ছি বুকের পাশে, যেন সহধর্মিণী......

তারপর পা টিপে টিপে নেমে পড়েছি রাস্তায়
জমজমাট অন্ধকারে, অলি-গলি, ঘর-বার সর্বত্র
একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে, ক্ষত্রিয় হয়েও
আমাকে তার ঘোর শত্রু করে তুলেছে।

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

যদি নির্বাসন দাও / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
        আমি বিষ পান করে মরে যাবো!
বিষন্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
        নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
        প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
    এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
    আমি বিষপান করে মরে যাবো।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
        এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
        মোচার খোলায় ঘোরে
        লুঠেরা ফেরারী!
শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
    বৃষ্টিতে চিক্কন তবু এক-একটি অপরূপ ভোর,
বাজারে ক্রুরতা, গ্রামে রণহিংসা।
    বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
        বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
        বুলেট ও বিস্ফোরণ
        শঠ তঞ্চকের এত ছদ্মবেশ
        রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাসফুল—
        এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুলি ছোঁয়াবো।
    আমি বিষ-পান করে মরে যাবো।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দীঘির পারে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
        স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক?

আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াউড়ি?
মোষের ঘাড়ের মত পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মত বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর বনের ঘ্রাণ
শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণস্বর?
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ.......
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

* মিশ্রবৃত্ত রীতি (মুক্তক) লয়—ধীর।

প্রিয় চাষী ভাই / তারাপদ রায়

স্লুইস্ গেট খোলা হচ্ছে না,—
স্লুইস্ গেট বন্ধ হচ্ছে না।

সেচ বাংলোর পিছনে ডুমুর গাছের নিচে
একজন মানুষ তিনতাস খেলছে
পাঁচ জন সহকর্মীর সঙ্গে—
মরছে ধরছে স্লুইস্ গেটের কপাটে।

দামোদরের খালে খলখল করে বয়ে যাচ্ছে জল,
দামোদরের দুই চড়ায় আউসের খেত
রোদে পুড়ে যাচ্ছে
তার মধ্যে আলের উপর দিয়ে
সন্তর্পনে হেঁটে যাচ্ছে এক জন গরীব মানুষ
সনাতন গরীব মানুষ,
পাঁচ হাজার বছরে যার চেহারা বদলালো না।

প্রিয় গরীব মানুষ
প্রিয় চাষীভাই, তুমি একই রয়ে গেলে,
তোমার কোনো ভাবনা নেই,

তোমার কোনো চিন্তা নেই
শতাব্দীর পর শতাব্দী তুমি হেঁটে যাচ্ছো
পোড়ো আলপথ ধরে।

তুমি জানো না—
কাজের জন্যে খাদ্য না খাদ্যের জন্যে কাজ
তুমি জানো না—
তুমি দুঃখে আছো তাই আমার পদোন্নতি হচ্ছে
তুমি জানো না—
তোমার এম. এল. এ সাহেবের চোখে ঘুম নেই
তুমি জানো না—
তোমার জন্য টাইম কাগজ
ফোটোগ্রাফার পাঠিয়েছে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে

প্রিয় চাষিভাই—
তুমি এই উন্নয়নশীল দেশের
শ্রেষ্ঠ সম্পদ
তোমাকে আমি দশবার বেচেছি
বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের কাছে
বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান
ম্যাকন্যসারা সাহেব তোমাকে বেশ ভালোবাসতেন।

প্রিয় চাষীভাই
আমাদের ভুল বুঝো না।
আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থেকো না।
তুমি হেঁটে যাও ঐ পোড়ো মাঠের মধ্যে দিয়ে,

টাইম কাগজের লোকজন এসে গেছে
এদিকে এরই মধ্যে আকাশে কালো মেঘ
জোর বৃষ্টি আসছে
খরা না বন্যা, তোমার কি আসে যায়
তুমি হেঁটে যাও
তোমার প্রোফাইল তুমি ঠিক রাখো।

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

কাল সারারাত / অমিতাভ দাশগুপ্ত

কাল সারারাত
একটা ছেলেকে ফলো করতে করতে
আমার স্বপ্ন ক্লান্ত হয়ে গেছে।

গোড়ালি-ছেঁড়া পাঞ্জাবি
আর, মভ্ রঙা পাঞ্জাবি পরা
সেই ছেলেটির মুখ
কখনো দেখা যায় নি।
ঠিক ঐটুকু জায়গা সে ছায়া দিয়ে
সব সময়ে চেপে রেখেছিল।
আমি জানি কারো মুখ না দেখতে পেলে
তাকে নিয়ে কবিতা লেখা কতখানি মুস্কিল
বিশেষ ক'রে তার চোখ।

তবে এই ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।
কখনো ঢিমে লয়ে, কখনো জোর কদমে
হাঁটতে হাঁটতে

যে গাইছিল—
আমার একটির পর একটি প্রিয় রবীন্দ্রনাথ
অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত।
আবার তারই গলার লী লী আগুনে জ্বলে উঠছিল—
অব মচল উঠা হায় দরিয়া আ!
—ভাই সাবধান, বড়ি আ-তুফান অথবা
—ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না
নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন্

তার শরীরের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল—
মেঘ, পাখি আর জেলের গরাদের ছায়া।
একটার পর একটা ফ্রেম ভেঙে
শিকারী কুকুরে কালো দিগন্ত রেখা পেরিয়ে
কী অবলীলায় চলে যাচ্ছে ছেলেটি

গাঢ় জঙ্গলের বুক চেরা পথে
গোয়েন্দার টর্চের মত তার পেছনে ছুটতে ছুটতে

একসময়ে মরিয়া গলায় চীৎকার করে উঠলাম—হল্ট্
সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ব্লাস্টিং এর শব্দ
বারুদের ধোঁয়ায় ঢেকে গেলে চারপাশ
পাহাড়ের কলজে ফাটানো গলায়
ছেলেটি গর্জে উঠল—আমি আসছি।
অথচ
সারা স্বপ্ন চেষ্টা করেও
তার মুখ দেখতে পাইনি আমি।
আর আপনারা তো সবাই জানেন
কারো মুখ দেখতে না পেলে
তাকে নিয়ে কবিতা লেখা কতখানি মুস্কিল।

* পদ্যকবিতা, ধীর লয়।

সে বড়ো কঠিন ঠাঁই / অশোক পালিত

নিশ্চিন্তে থাকতে চাও তো ফ্ল্যাট কেনো
তোমার নিজস্ব ফ্ল্যাট
সে বড়ো আরামের, বড়ো আশ্বাসের।
শীতের রাত্তিরে আগুন জ্বালিয়ে নাও,
লেলিহান নয়
নৈশসুখের মতো উপাদেয় নরম আগুন।
পারলে বেড়িয়ে এসো
একান্ত ব্যক্তিগত নিভৃত বাগানে
কণ্ঠে থাকে অতুলপ্রসাদ 'সে ডাকে আমারে'

খোসা-ছাড়ানো বাদামের মতো
সুখের টাটকা দানা
চিবোতে চাও তো তা-ও পাবে
বেশি দূর নয়
চাঁইবাসা কি চক্রধরপুর
আলগোছে থেকে এসো দু'দিন তিনদিন।

জনতার কাতারে দাঁড়ানো সে বড়ো কঠিন ঠাঁই।
যে মাটিতে যাওয়া মানে
গায়ের চামড়ার রঙ পুড়ে কালো হ'য়ে যাওয়া।

তার চেয়ে
দুপুর গড়াতে দাও বড়জামদার আদিবাসী হাটে
তোমার পায়ের নিচে মাটি থাক সুখী ও সৌখীন,

* মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের মুক্তক রূপ। লয় ধীর।

অশোক পালিত ও স্বপ্না মজুমদারের আবৃত্তির ক্যাসেট—'কথা বলছি'—সেই ক্যাসেটে আরো কিছু কবিতার সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ হে', 'দু'কদম পিছোও', ও 'সে বড়ো কঠিন ঠাঁই' এই তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন অশোক পালিত। আগ্রহীজন ক্যাসেটটি সংগ্রহ করে শুনে নিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ হে / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাখ থেকে সুরু হলেও
অনেক দূরে চলে যান
রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন ছেড়ে শেষদিন চলে যাবার সময়
তাঁর চোখে ছিল সান্‌গ্লাস
শ্রাবণের সেই দিনে
কী এমন উজ্জ্বল প্রহার থেকে
সান গ্লাসে চোখ ঢেকে
চলে যাও তুমি
রবীন্দ্রনাথ

বৈশাখ থেকে সুরু হলেও
বহুদূরে চলে যায় বৈশাখ
সানগ্লাস চোখে নেই বলে
রবীন্দ্রনাথের শহরে
চোখ জ্বলে
দৃষ্টি পোড়ে
রবীন্দ্রনাথ হে,
একবার দেখে যেতে পারো না কি
কতদূরে চলে গেছে এশহর
ভালোবাসা থেকে সন্তোষ থেকে
পঁচিশে বৈশাখের থেকে কতদূরে আজ বৈশাখ।

* গদ্যকবিতা। অনিয়মিত পর্ব বিভাগ। ধীর লয়ে পাঠ।

দু'কদম পিছোও / রণজিৎ সিংহ

হাত ধুয়ে বারুদের গন্ধটা তাড়াও
দাড়ি কামাও—চুল আঁচড়াও
শরীরের জখমগুলিকে
কড়া ইস্তিরির ঝল্‌মলে সিন্থেটিক, আড়াল করো।
এবং ভদ্দর লোক হও।

চলো যাওয়া যাক্—পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে
ইডেনের রঙিন ক্রিকেটে
ইউ. এস. আই. এস-এর—উপন্যাসে আধুনিকতার লক্ষণ
অথবা চলচ্চিত্রের ভাষা বিষয়ক আলোচনা সভায়
ভদ্দর লোকেরা যায়।

ভুলে যাও খিদে
ভুলে যাও শোষণ
ভুলে যাও শ্রেণী সংগ্রাম
রপ্ত করো নতুন পরিভাষা এ্যালিয়েনেশন, লোন্‌লিনেস
বোর্‌ডম এবং পজেশন
তোমার ভুরু কোঁচকায় কেন বুদ্ধুরাম
ভুলো যাও—এখানে শূয়োরের খোঁয়াড় কলি ফেরাচ্ছে
নীলামে বিপ্লব বিকোচ্ছে
থানা আদালত আর সর্বজনীন পূজা কমিটির
দরদরা বাড়ছে

সাবাস দাও সি. এম. ডি. এ-কে
কলকাতা হ'য়ে উঠছে কল্লোলিনী-তিলোত্তমা
প্রশ্ন তুলো না মেনে নাও
মেনে নাও আর পিছোও
ভদ্দর লোকেরা নেয় আর পিছোয়
পিছোও দু'কদম
এগিয়ে যাবার সেই অভ্রান্ত তত্ত্বে।

* পদ্যকবিতা। ধীর লয়ে পাঠ্য।

আধুনিকতার শেপ / তুষার রায়

এ রকমই হবে ভবিষ্যতে নাটক যখন
পাত্র-পাত্রী চুপচাপ যাবে আসবে, কাছে কিংবা দূরে
ভারসাম্য বিচলিত হাত পা এবং মাথা নাড়বে,
করাত ঘষার মতো কর্কশ শব্দ কিংবা সুরে
আবহসঞ্চার কিংবা নৈঃশব্দকে পাংচার করে যেন
স্পষ্ট কথার মতো কষ্ট দেবে কানে,
এ রকমই হবে নাটক, যখন পাঠককে অস্ত্রোপচারে
উপযোগী করে নেওয়া হবে নাটকের, যাতে কিনা
শিকারের দৃশ্যে বাঘ মারতে পারবে সেও, যাতে পারে
দুঃখের সিনে হাসতে, বিচারের সময়ে কাশতে
এবং অভিকর্ষহীনতায় যাতে কিনা ভাসতে পারে
এবং অক্সিজেন ছাড়াও নিতে পারে নিঃশ্বাস,

আমার বিশ্বাস, এ রকম এ রকম বা সেরকম
যে রকমই হোক না কেন কবিতা অথবা নাটক
যাতে কবি, নাট্যকার কিংবা পাঠক, এই তিনেই
আসল ব্যাপারগুলো শুনে জেনে অথবা চিনেই
আত্মহত্যার দৃশ্যে আত্মহত্যা, খুনের দৃশ্যে খুন
করতে পারবেন ধর্ষণের দৃশ্যে প্রকৃত রেপ
তা হ'লেই দেখবেন চমৎকার প্যাটার্ন বা শেপ
একটা এসে যাচ্ছে আধুনিকতায়।

* মিশ্রবৃত্ত ছন্দের এ এক অতি-আধুনিক রূপ, লয়—ধীর।

নোলক / আল মাহমুদ

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে?
—হাত দিওনা আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।

জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিক্‌মিক্‌
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেরে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাব তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন।
আমরা ত' সব পাখ-পাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছে নোলক পরিনাত'
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও হাত পাতো হাত পাতো—
বনে-পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক।
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।

* দলবৃত্ত রীতির ছন্দ। লয়—দ্রুত।

তেলবেগর কুপি আর ঘুটঘুইটা আঁধার / নন্দদুলাল আচার্য
(আঞ্চলিক ভাষার কবিতা)

আহা, বড় সুঁদর বললি বাপ্
উৎলার জলের লাই সুখ আমার
সারা শরহীলে বইতে লাইগল্যেক।

খেলাই চণ্ডীর কিরা বেবু
দেবতা, তো আমান্দের তুরাই ..... লেতা!

বললি, "খাট্ খাট্
সবেঁ ঠিক হইয়ে যাঁবেক।"
বাস্কি ভাত কাম্থা আড়া খাঁইয়া
খাট্ছি ত বাপ্ বায়াম্নো ঘুরাব।

লিয্যস্ হৈছেও সব ঠিক—
মারাং মারাং ওড়াক
দালান গাড়ী সেলেমা—
বাপ্ হে, কাদের লেইগ্যে?

আমাদের জমি জিরাত খারাই
কাদের নামে জরিপ হৈঁলো?
আমাদের সেই খুপরিকে সেই!
বেবু টৈম ত অনেক বিতাইল!
কোয়লা ডিপুতে মারাং গাড়ীর
পেট ভরাইলম· দেড় কুড়ি বচ্ছর।
লিশায় চুঁর হঁয়ে পুরুষ বেটা ছিলাগুলানের
বুক ছিঁদা

উরা লিশা করে কেনে বেবু?
কোয়লা খাদের গাড়ায় মরদ যাঁইয়ে
আর ঘরে ফিরল নাই। কেনে?

ছুটানুনার কিরা বেবু
দেবতা ত আমাদের তুরাই.....লেতা।
বল্‌লি "রাইত্‌কে দিন বেনাব।"
লিয্যস হৈছেও সব ঠিক
—টিরেন ওড়াকল বিজ্‌লিবাতি
বাপ্‌ হে কাদের লেইগে?

আমাদের ঘরে সেই কে সেই
তেলবেগর কুপির আর ঘুট্‌ঘুইটা আঁধার।
আহা, বড় সুঁদর বললি বাপ্‌
উৎলার জলের লাই সুখ আমার
সারা শরহীলে বইতে লাইগ্‌ল্যেক।

* গদ্যকবিতা, ধীর লয়।

মাসিপিসি / জয় গোস্বামী

ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায়, জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে
ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে

শুকতারাটি ছাদের ধারে, চাঁদ থামে তালগাছে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ছাড়া কাপড় কাচে

দু এক ফোঁটা শিশির তাকায় ঘাসের থেকে ঘাসে
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ট্রেন ধরতে আসে

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির মস্ত পরিবার
অনেকগুলো পেট বাড়িতে, একমুঠো রোজগার

ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির পোঁটলা পুঁটলি কোথা?
রেল বাজারের হোমগার্ডরা শাত ঝামেলা জোটায়

সাল মাহিনার হিসেব তো নেই, জষ্টি কি বৈশাখ
মাসিপিসির কোলে-কাঁখে চলের বস্তা থাক

শতবর্ষ এগিয়ে আসে—শতবর্ষ যায়
চাল তোলো গো মাসিপিসি লালগোলা বনগাঁয়।

* দলবৃত্ত রীতি, দ্রুত লয়।

॥ পরিশিষ্ট ॥

(আবৃত্তি বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক লেখা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ঃ আবৃত্তি প্রসঙ্গ

ক্ষেত্র গুপ্ত

কবিতা আবৃত্তি আজ আর অশিক্ষিত পটুত্ব নয়, বহু অনুশীলন এবং বিস্তৃত কলাবিধি তাকে এক নব্য শিল্পে উন্নীত করেছে। বিভিন্ন স্কুলিং জন্ম নিয়েছে, তারা আবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নিয়ে লড়ছে। এ বিষয়ে অবশ্যই আজ অধিকারীভেদ দেখা দিয়েছে। যে-কেউ এসে কিছু একটা বলে দিয়ে যাবেন, এমন না ঘটা বাঞ্ছনীয়।

আমি আবৃত্তিতে পারদর্শী নই, আবৃত্তির রীতি ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছি বা অনেক পড়েছি, তেমন দাবিও করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আমার পক্ষে গম্ভীরভাবে কোনো প্রবন্ধ লেখা প্রায় বিড়ম্বনা। তবুও লিখছি কারণ—

১. বন্ধুবর নীলাদ্রিবাবুর (আবৃত্তি আকাদেমী) চাপ। খোঁড়াকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোবার কোনো বাসনা হয়ত তাঁর থেকে থাকবে।

২. কবিতা নিয়ে চর্চা, আবৃত্তির দিক থেকে নয়—সাহিত্য হিসেবে—আমার পেশা, নেশাও বটে।

৩. একসময়ে সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি বই লেখা গিয়েছিল, তাতে তাঁর কবিতার আবৃত্তি-বিষয়ে কিছু বলা গেলেও যেতে পারে, এরকম একটা বিভ্রম আমার এবং অন্যদেরও হওয়া অসম্ভব নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা খুব যে আবৃত্তি হয়, এমন নয়। পাঠ্যপুস্তকের জন্য যেটুকু পরিচিতি তা কতকাল টিকবে বলা শক্ত। তবে এ বছর কবির জন্মশতবর্ষ। কিছু উৎসবে-অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হচ্ছে, তাঁর কবিতা পড়া হচ্ছে। রিচ্যুয়ালের বাইরে তার আয়ু থাকবে তো? এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত আছে যে সব প্রশ্ন—

১. আবৃত্তির দিক থেকে বিচারে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এমন কোনো সম্ভাবনা আছে কি, যাতে তা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য?

২. যদি এটা কর্তব্য বলে মনে হয় তাহলে কারা কীভাবে সে দায়িত্বের কতটুকু বহন করতে পারেন?

প্রথমেই বলা ভালো, নিজের সময়কে ছাড়িয়ে দূর ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার শক্তি কম কবিরই থাকে। সব দেশে সব যুগে তা সত্য। তার জন্য ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ার কারণ নেই, জোর জবরদস্তি করে কাউকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেও লাভ নেই। কাব্যরসিক পাঠক পুরোনো যুগের কবিতা পড়ে খুশি হবেন, প্রথম স্তরের মুষ্টিমেয়

কবির পাশে মাঝারি শক্তির ভালো কবিতা থেকেও তিনি সুখ খুঁজে পাবেন। সাহিত্যের ছাত্র পড়বেন, গবেষকেরা নাড়াচাড়া করবেন, সঙ্কলনে সংগৃহীত হবে। সমালোচক মূল্যায়ন করবেন—সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রাপ্য স্থানটুকু বিচলিত না হয়। এই বাঁচার দাবি মাঝারি কবিরাও করতে পারেন ভবিষ্যতের কাছে। কিন্তু একেবারে শ্রেষ্ঠ সাধনা ছাড়া জনজীবনে নিত্যপাঠ্য হয়ে ওঠার আশা আর কারুর থাকে না। আবার গুণে শ্রেষ্ঠ হলেও জন ব্যবহারে জীবন্ত থাকা অতীতের কবিদের ভাগ্যে কমই ঘটে। মধুসূদন দত্তের কবিতা কজন আনন্দের জন্য, দুঃখের জন্য পড়ে? কতটুকু তার আবৃত্তির আসরে পঠিত হয়? অত বড় কবি হলেও লোকের কাছে আজ আর তা নিত্য ভোগের বস্তু নেই। সেক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। এর মধ্যে আছে ইতিহাসের বিধান—যার অন্য নাম জনপ্রিয়তার সমাজতত্ত্ব। সঙ্গে সঙ্গে একথাও কি ভাবব না—সত্যেন্দ্রনাথের সমকালে এবং পরে যে খ্যাতিমান কবিকুল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে এবং রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সনেটকার প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল মজুমদার, তাঁদের কজন এখনকার কাব্যপাঠকদের কাছে সমাদৃত—কতটুকু সমাদৃত? এক নজরুল ছাড়া কার আর স্থান মিলেছে কবিতা পাঠের গণ-আসরে? তাই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার উপযুক্ত সমাদর হল না বলে শোক করব না।

তবে আবৃত্তির দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার কিছু ব্যাপক ব্যবহার হবার সম্ভাবনা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের যে বহুমুখী বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে আবৃত্তিতে নানাভাবে কাজে লাগাতে পারেন পাঠক-শিল্পীরা। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনেকখানি বজায় রেখে, বিষয়ে জট না পাকিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ কবিতার চেহারায় অজস্র রকমফের ঘটাতেন অনায়াসে। চরণের দৈর্ঘ্যে, সংখ্যায়, অন্ত্যানুপ্রাসে, আভ্যন্তর অনুপ্রাসে, স্তবকসজ্জায় মুহুর্মুহু নতুনত্ব নিয়ে আসায় তাঁর জুড়ি সমকালে ছিল না, একালেও দুর্লভ। কবিতাপাঠের আসরে পাঠকের কণ্ঠে উচ্চারণে, মেজাজে, সুরে, বিচিত্রতা সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা। শ্রোতাকে তৃপ্তি দিতে পারে—যদিও কিছু পুরাতনী, কিছু সনাতনী স্বাদ, কারণ কবির সঙ্গে আমাদের কালে-ভাবে দুস্তর ব্যবধান।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ছন্দের কবিতা লিখেছেন, গম্ভীর গাঢ় কল্পনায় ভ্রমণ করেছেন, লঘু-চটুল নৃত্যে শব্দকে মাতিয়েছেন। গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক গুমটকে অথবা উপলঝঙ্কৃত পাহাড়ী ঝর্ণার নৃত্যলাস্যকে শব্দবন্ধে ধরেছেন। বাংলার বর্ষার কত ভিন্ন সুর আর মেজাজই না প্রকাশিত নানা ছন্দের ভঙ্গিতে, ছোট বড় চরণ বিন্যাসের কৌশলে, যুক্তাক্ষরের বাজনায়। সত্যেন্দ্রনাথের এসব রচনাই পূর্ণ সম্ভোগের জন্য আবৃত্তির

অপেক্ষা রাখে। অনেক কবির কবিতাকে পুরো পেতে গেলে নিজেকে পড়তেই হবে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ভালো করে পড়েও কানে শুনতে হবে—পাঠকের অভাবে নিজে পড়ে নিজে শোনা অন্তত। একজন প্রবীণ সমালোচক বলেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের চোখের পেছনেই আছে কান। যা দেখতেন তাই বদলে নিতেন ধ্বনিতে—আওয়াজে। আওয়াজকে করতেন দেখার ছবির, করতেন স্পর্শে রূপান্তরিত—'তুলতুল কোন ফুল'—'তুলতুল'—এই শব্দে অর্থ কতটুকু, যতটা স্পর্শের লঘু কোমলতা। এসব ধরিয়ে দেবার জন্য চাই যোগ্য কবিতাপাঠক। আর কবিতাপাঠকও যদি শ্রমের সুর, নাচের তাল, ঋতুর বদল, গাছের পাতার ফুলের শব্দগন্ধস্পর্শ, ঝরণার-নদীর-সমুদ্রের রকমফের ধ্বনিকে কণ্ঠের কোমল, গাঢ়, লঘু, তরল, গম্ভীর, কর্কশ বৈচিত্র্যে আয়ত্ত করতে চান, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে সে-সুযোগ করে দেবে।

*এই লেখাটি কয়েকবছর আগে 'বাল্মীকি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা এটিকে পুনর্মুদ্রিত করলাম।

এই যে প্রশ্নটা কবিতা পাঠ্য না শ্রাব্য, এটা একটা আধুনিক প্রশ্ন। কারণ দুশো বছর আগে এরকম প্রশ্ন কেউ তুলত না। ছাপাখানা চালু হবার পরে, যখন ঘরে বসে বই পাওয়ার ব্যাপারটা সুলভ হয়েছে, তখনই কথাটা এসেছে। তার আগে তো সবই শ্রাব্য ছিল। ক'টা লোক আর পুঁথি জোগাড় করতে পারতো? কথক ঠাকুররা বা অন্যরা পড়ে পড়ে শোনাতেন। কিংবা মুখস্থ শোনাতেন,......অষ্টাদশ শতব্দীতে যখন ছাপাখানার প্রসার ঘটে, বই জিনিষটা সুলভ হয়, এমন কি সাহিত্য জিনিষটা রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছেড়ে জনসাধারণের কাছে আসে, তখনই এই শিল্প নিজে নিজে বাড়িতে বসে উপভোগ করার সুযোগটা আসে। ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যও আসে এবং তখন গদ্যের সঙ্গে কবিতার, বলা যায়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ঘটে। আগে কবিতা দিয়েই সব কাজ চালানো হ'ত। এমনকি ধারাপাত পর্য্যন্ত ছন্দ মিলিয়ে পদ্য করে লেখা হ'ত। গদ্য এসে এই সব দায়িত্ব নিয়ে নিল। তখন কবিতার কাজ হ'ল সূক্ষ্মতার দিকে যাত্রা।....যাতে শব্দ দিয়ে একটা নির্ম্মাণ করা যায়, কবিতার মধ্যে দিয়ে একটা ঘটনা বা গল্প না বললেও চলে। এমনকি কিছু বর্ণনা না করলেও চলে। শুধু শব্দের ধ্বনি দিয়ে সব চিন্তার মালা গেঁথেও একটা সার্থক কবিতা লেখা যায়। এই যে সূক্ষ্ম শব্দের ব্যবহার, সে কবিতা এরকম প্রকাশ্য জনসভায় আবৃত্তি শুনে, পাঠ শুনে, কতটা বোঝা যায়? সত্যি কি বোঝা যায়? যায় না।

....এই এখন যে কবিতা পড়ে শোনানো, জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটা এসেছে, এটাও বোধহয় মিডিয়া-র যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তাই থেকে এসেছে। অর্থাৎ

প্রথমে এল গ্রামোফোন রেকর্ড এবং রেডিও। টি ভিও এসে গেছে। এই প্রচার যন্ত্রগুলোর মধ্যে অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে কবিতা বা সাহিত্যও এসে যায়। আমাদের মনে আছে গ্রামোফোন রেকর্ড যখন চালু হ'ল, তখন নাটক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডে কবিতা আবৃত্তিও চালু হয়েছিল। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সেই গলা কাঁপানো আবৃত্তি আমরা সবাই শুনেছি। তারপর রেডিও। রেডিও-তেও অনেক কিছুর সঙ্গে কবিতা আসে। এইভাবে এখন সভাসমিতিতে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে কবিতা পড়ার একটা রেওয়াজ হয়েছে। এবং অনেকে, যাঁদের কণ্ঠস্বর ভালো, যাঁরা কবিতার অনুশীলন করেন উচ্চারণের চর্চা করেন, তাঁরা কবিতাপাঠ করে জনসাধারণকে আনন্দ দিচ্ছেন, এটা দেখা যাচ্ছে, এবং দেখে আমরা আনন্দিত হচ্ছি। আমরা যারা কবিতা লিখি, এখন দেখছি যে, আমাদের কবিতা আমরাই পড়ছি না, অন্যরাও পড়ছেন। আমাদের তো আনন্দিত হবার কথা বটেই।....এখন কবিদেরও টেনে আনা হচ্ছে মঞ্চের ওপর। পাশাপাশি আবৃত্তিকাররা আবৃত্তি করছেন। এই দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ কিন্তু সবসময় থেকে যায়।

....কবিরা যেগুলো পড়েন, কবিরা নিজেদের লেখা যে ভাবে পড়েন সেগুলো হচ্ছে পাঠ আর যাঁরা সেই কবিতা লেখেন নি কিন্তু কবিতা ভালোবাসেন, তাঁরা যখন সেগুলো পড়েন সেটা আবৃত্তি, এখন, তাঁরা যেহেতু অনেক লোকের মধ্যে সেই কবিতাটি পৌঁছে দিতে চান, কবিতার রসটা পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন, সুতরাং তাঁরা যার যার সাহায্য নেওয়ার, সেটা নেবেনই। যেমন কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়া, কিছুটা নাটকীয় স্তব্ধতার সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য কিছু।... যেহেতু টিকিট বিক্রী করে লোক ডেকে আনা হয়েছে, সে হেতু যত উপায়ে তাদের কাছে সেটা পৌঁছে দেবার চেষ্টা তারা সবরকম করবেন।.....আবৃত্তিকাররা কণ্ঠের ওপর নির্ভর করেন এবং যেহেতু তাঁদের কণ্ঠস্বরটা জোরালো, তাতেই অনেকটা কাজ হয় বলে মনে হয়। এখন কবিরা যাঁরা পড়েন, তাঁদের যেহেতু অনেকের সামনে পড়তে হয়, তাঁরাও আর আগের মতো করে পড়েন না। তাঁরাও কিছুটা চালাক হচ্ছেন।......

.....আমি বলতে চাই কবিরা যে ভাবে পড়েন, সেটা হয়তো সবসময় কণ্ঠস্বরের বা উচ্চারণের বা অন্যান্য দিক থেকে তেমন উচ্চাঙ্গের হয় না, কিন্তু তার একটা আবেদন আছে। সেটা যদি পাঠ বলা যায়, তা হলে সে পাঠটা চালু আছে, কোন ক্ষতি নেই। এবং আবৃত্তিকাররা যে আবৃত্তি করেন, তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমরা যারা কবিতা লিখি, বলবো, তাঁরা ভালো কাজই করেছেন।

*সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লেখাটি আসলে এক আলোচনার মুদ্রিত রূপ, যা 'ছন্দনীড়' পত্রিকায় একসময়ে ছাপা হয়েছিল। আমরা তার থেকে অংশবিশেষ এখানে পুনর্মুদ্রিত করলাম।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

অশোক পালিত

কথাটা paradox-এর মতো শোনালেও নিতান্ত সত্য যে, রবীন্দ্রযুগের মানুষ না হয়েও রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে আমরা যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, আধুনিক কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা'ত দূরের কথা, বরং অস্বস্তির অনুভব হয় আমাদের। ব্যতিক্রম হিসাবে জনাকয় আবৃত্তিকারের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে আধুনিক কবিতা আবৃত্তির কাজটা যে সহজ নয়, আশা করি, এটা সকলেই, অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা মেনে নেবেন। প্রশ্ন হোলো, কি সেই মৌলিক পার্থক্য, যা একটাকে সহজ, অন্যটাকে অসহজ করে তুলেছে।

সংক্ষেপে এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর আধুনিক কবিতার স্বভাবে অন্তর্লীন পার্থক্য। "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক্ থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত অন্ততঃ মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকে আধুনিক বলে যদি গণ্য করা হয়, তবে আলোচনার একটা মোটামুটি স্পষ্ট পরিসর পাওয়া যায়। আসলে দুটো যুগের মধ্যে এমন সব সর্বাত্মক প্রভেদ ঘটে গেছে, যা অন্যান্য অনেক কিছুর মত কবিতাকেও পাল্টে দিয়ে গেছে। আবৃত্তিকারকে এটা স্মরণে রাখতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বভাব সম্পর্কে আপাতত এইটুকু বলা যায়—তা 'যুক্তি গ্রথিত পারম্পর্য' বা Logical Sequence মেনে চলে তার মধ্যে আছে নাটকের স্থাপত্য (উপস্থাপনা, বিষয়ের তুঙ্গে আরোহণ আর উপসংহারের ঘন প্রশান্তি)। যার জন্য আবৃত্তিকারের কাজটা সহজ হয়ে আসে। তাছাড়া আর একটা কারণেও তাঁর কবিতা আবৃত্তি করা খুব সাবলীল। রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই জানতে শুরু করি—স্কুলে, কলেজে, নানা প্রতিষ্ঠানে, মঞ্চে পর্দায়, বেতারে, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি যেন অমোঘভাবে উপস্থিত। তাঁর প্রায় যাবতীয় কীর্তির সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত। তাঁর কবিতার আবৃত্তি তাঁর স্বকণ্ঠে (Record-) 'ত শুনেইছি, অন্যান্য অনেকের মুখেও তা প্রত্যহ শুনতে হয়। ফলে তিনি আজ এক সংস্কার হয়ে আছেন আমাদের মধ্যে। আমাদের বোধ-বুদ্ধি কল্পনা—ধারণায়।

অথচ, আধুনিক কবিদের ক'জনকে আমরা এইভাবে চিনি? অনেকের মুখের ছবিও দেখি নি সম্ভবতঃ। তাঁদের অন্যবিধ কীর্তিকলাপের সাথেও আমাদের পরিচয় নেই। শুধু তাঁদের কিছু কবিতার সঙ্গেই যা আমাদের যোগাযোগ। যার মধ্যে অযোগটাই পরিমাণে বেশি। আর সেই সব বিচিত্র জটিল অনুভূতিমালার কবিতা, ভাবে আর ভাষায় যাদের মধ্যে Emotional Sequence বা 'আবেগ গ্রথিত পারম্পর্য' থাকলেও, Logical Sequence-এর বড় অভাব, দেখতে পাই যেন। প্রথম নজরে যাকে অসম্বন্ধ

বলে মনে হয়। কবিতার মধ্যে ভাবের বিন্যাসে সেই চেনা নাটকীয় স্থাপত্যকে খুঁজে পাই না—বরং লক্ষ্য করি চলচ্চিত্রের কিছু 'মনটাজ'; আপাত নৈর্ব্যক্তিক উল্লেখের মত উল্লম্ফন-প্রবণ আধুনিক কবিতা আমাদের আক্রান্ত করে ঠিকই, যেমন করেছে ফ্রয়েড, আইনস্টাইন, মার্কসের চিন্তাধারা, ভগবানে অবিশ্বাস বা না-ঈশ্বরে বিশ্বাসের মনোভাব, যেমন করেছে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ আর নতুন পথ খুঁজে নেবার সক্রিয় তাগিদ। কিন্তু হায়! আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করার সঠিক প্রকরণ খুঁজে পাই না যেন, সেই একান্ত গায়কী। না নিজের মধ্যে, না অন্যত্র। যদি বা কখনো কারো কাছে পেয়ে যাই তাও যেন যথাযথ নয় বলে মনে হয়, যা এখনও আমাদের অনেকের বোধে আর কণ্ঠে ধরা দেয় নি। ফলে আবৃত্তিকারের কাজটা কত কঠিন হয়ে আছে ভেবে দেখুন।

অবশ্য কঠিন থাকবে না। দিন যত যাবে, তত আয়ত্তে এসে যাবে প্রকাশের জটিল পথগুলো, যত নিজেদের চিন্তে পারবো আধুনিক কবিতার মধ্যে, যত দেখতে পাবো আমাদের অনুভূতির রিলিফ মানচিত্রকে, তত মমতা আসবে। চেনাজানার সূত্র ধরে একদিন আধুনিক কবিতাকে ভালোবাসার মনও এসে ধরা দেবে অভাবনীয়ের মত। আসলে, কবিতাকে ভাল না বাসলে, কোনো কবিতাই আবৃত্তি করা যায় না।

ভালোবাসার সাধনা আগে, তার পরে প্রসাধনের কথা। এই সাধনার জন্যেই আমাদের কবিদের কবিতা পড়তে হবে নিয়মিত। কবিতার মর্ম অনুযায়ী কখনো অনুচ্চ কণ্ঠে, কখনো উদাত্ত গলায়। কবিকেও জানতে হবে। যতটা জানা যায়। আয়ত্তসাধ্য সকল সূত্র অনুসরণ করে।

১৯১৪ থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পট পরিবর্তন শুরু হয়েছিল এবং এখনো যা নিয়তই প্রত্যক্ষে পরোক্ষ ঘটে চলেছে তার রেখাচিত্রটা অন্তত জানা চাই। কেননা, "আধুনিক বাংলা কাব্যের পটভূমিকা দুই মহাদেশে বিস্তৃত হয়ে আছে।" আজকের জীবনের মতো আধুনিক কবিতাও এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি।

আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে প্রথমেই যে অসুবিধে বোধ করা যায়, তাকে বলে Semantic disturbance অর্থাৎ বাক্যের কর্তা, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির পরস্পরের সম্পর্কহীনতা। তারপর স্বপ্নে যেমন অসংলগ্নতা অনুভব করা যায়, তেমনি আজকের কবিতাও যেন চিত্রকল্প থেকে চিত্রকল্পে লাফিয়ে চলল, উল্লেখ বা allusion যখন তখন যেখানে সেখানে স্ফিংক্সের মত বাধা হয়ে বসল। ব্যাকরণের শৃঙ্খল ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরীতির সঙ্গে কথা বলার বাক্‌রীতির অনায়াস মিশ্রণ ঘটে গেল। যে কোন শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন সংস্কার রইল না, ভাবকে সংহত করে আনা, শব্দকে অর্থঘন করে তোলার জন্যে কবিরা সৃষ্টি করে নিলেন এক নতুন কাব্য ভাষা—a language will in a language.

এই কাব্য ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে তখন আবৃত্তির কাজটাও আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসবে। তখন 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র বা 'পূরবী''পুনশ্চ'-র কবিতা আবৃত্তি করার আত্মবিশ্বাসের মত আর এক আত্মবিশ্বাস (বা আস্থা) নিজের মধ্যেই তৈরী হবে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" "অর্কেস্ট্রা" "একমুঠো" "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" বা "দ্রৌপদীর শাড়ী"-র কবিতা আবৃত্তি করার প্রস্তুতিতে।

তখন আপনারা যেটাকে আবৃত্তি করার practical দিক বলেছেন অর্থাৎ কবিতার ব্যাকরণ ও ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে সমস্ত ধরনের প্রকাশভঙ্গি স্বরসাধন পদ্ধতি, কণ্ঠস্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্ষেপন, মাইক্রোফোনের ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করার ব্যাপারটাকে মিলিয়ে নেওয়া আর কঠিন হবে না।

তবে একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথের বা আধুনিক কবিদের যারই হোক, কবিতা আবৃত্তি করার সময় কবিতাটিকেই অর্জুনের লক্ষ্যভেদ করার সেই পাখীটার মত বোধে রাখতে হয়। ধনুর্বিদ্যার যাবতীয় প্রয়োগ তখন সংহৃত—স্থির। কলাকৌশল বা অপ্রয়োজনীয় কারুকার্য দেখানোর সময় নয় তখন—তখন শুধু ঐ শঙ্খ ঘোষ মহাশয় যাকে বলেছেন, "আবৃত্তিযোগ্য কবিতাটির কাছে বিনীত ভাবে গিয়ে পৌঁছনোই আবৃত্তিকারের কাজ।"

এ পৌঁছনোয় দায়িত্ব আছে। শ্রোতাদেরও পৌঁছে দিতে হয়। সঠিক দর্শন করিয়ে দিতে হয় কবিতা বিগ্রহটিকে, যাতে তাঁরাও বিনীত হয়ে কবিতা অনুভবে জারিত হতে পারেন।

প্রায় বছর দশেক আগে ছন্দনীড় পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করলাম।

প্রশ্নোত্তর পর্ব.........১

প্রশ্নকর্তা, লেখক, উত্তরদাতা—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন : কবিতা আবৃত্তিতে নাটকীয়তা সম্পর্কে কবি, আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসেবে আপনার মত কি?

উত্তর : কবিতা আবৃত্তিতে নাটকীয়তা থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে কবিতাটির মধ্যে নাটকীয়তা থাকা বা না থাকার ওপর। তবে এ ব্যাপারে দু একটা কথা মনে হয়। যেমন কবিতাতে আপাততভাবে নাটকীয়তা লক্ষ্য না করা গেলেও অনেক সময় তার রস বিস্তারের মধ্যেই নাটকীয়তা উপস্থিত হতে পারে। যে আবৃত্তিকার কবিতার মর্মে প্রবেশ করে তার ব্যঞ্জনা কণ্ঠের মধ্যে আনতে পারে সে সার্থক আবৃত্তিকার।

আবার অনেক সময় কবিতায় নাটকীয় উপাদান থাকলেও আবৃত্তির সময় উপস্থাপনাটা কম নাটকীয় করলেই হয়ত কবিতার নাট্যরস বেশি প্রকাশ পেতে পারে। নাটকীয়তা খুব সদর্থে বলছি—ভাবলুতায় মাখানো নাটুকেপনার থেকে তা আলাদা।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তিতে ও অভিনয়ে কি একই ভাবে শব্দ উচ্চারিত হবে?

উত্তর ঃ গোল বাধছে 'উচ্চারণ' কথাটা নিয়ে। উচ্চারণ যদি শুধুমাত্র শব্দের যথার্থ প্রকাশ হিসাবে দেখা হয় তবে বলব বাংলা ভাষায় শব্দসমূহের যে ভাবে উচ্চারণ করা বিধেয় তা অভিনয় ও আবৃত্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রয়োজ্য। কিন্তু উচ্চারণ বলতে নিশ্চয়ই Modulation ও অভিব্যক্তির প্রকাশ বোঝানো হচ্ছে না। তেমন হলে তো এক অভিনয় থেকে আর এক অভিনয়েই উচ্চারণ পাল্টে যায়—অভিনয়ের থেকে আবৃত্তিতে পাল্টাবেই। এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার আবৃত্তি প্রধানত কবিতার বলে সেখানে ছন্দ যতি ইত্যাদির প্রভাবে উচ্চারণে যে সুরময়তার ছোঁয়া লাগে সেটা অভিনয়ে চলে না। কেননা অধিকাংশ সময়েই অভিনয় গদ্য সংলাপ নির্ভর। পদ্যে লেখা নাটকে যেমন গৈরিশ ছন্দের ক্ষেত্রে আবার উচ্চারণ আবৃত্তিধর্মী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ঃ অভিনয় ও আবৃত্তি শিক্ষার মধ্যে মিল আছে কি? যদি থাকে, তা কী ধরনের?

উত্তর ঃ অভিনয় ও আবৃত্তির শিক্ষার মধ্যে মিল কি আছে জানিনা। আবৃত্তি করতে করতে জিভের ও কণ্ঠস্বরের আড় ভাঙতে পারে। সেইদিক থেকে সেটা অভিনয় শিক্ষার সহায়ক হতে পারে। আবার অভিনয় চর্চার থেকে কবিতা উপস্থাপনার মধ্যে নাটকীয়তা (আবার সদর্থে বলছি) সৃষ্টির ক্ষমতা তৈরি হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কোন কবিতায় যদি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির বক্তব্য বর্ণিত থাকে—আবৃত্তিকারের গলায় কি সেই বয়সের সুর ফুটে উঠবে? এক্ষেত্রে অভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তির তফাৎ কতটুকু?

উত্তর ঃ বিভিন্ন বয়সের সুর ফুটিয়ে তোলার আদৌ যদি প্রয়োজন হয় তাহলেও সেটা ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। এরকম ক্ষেত্রে কাজটা তো অভিনয় কর্মের কাছাকাছিই চলে আসে।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন নাটকের অনেকগুলি স্তর থাকে, উন্নতমানের অভিনয় দ্বারা তাকে ফুটিয়ে তোলা যায়। তেমনি কবিতার ক্ষেত্রেও এমন বক্তব্য থাকে যেগুলি অনেক স্তর ছুঁয়ে যায়। আবৃত্তির দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কি?

উত্তর ঃ কবিতার নানান স্তরকে আবৃত্তির দ্বারা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে আবৃত্তিকারের দক্ষতার ওপর এবং বিশেষত তার কাব্যবোধের উপর।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তি কি অভিনয়কে অনুসরণ ক'রে স্বকীয়তা হারায় না? যদি তাই হয় তাহলে 'অভিনয় এবং আবৃত্তি পরস্পরের পরিপূরক—একথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নটি আমার কাছে একটু ধোঁয়াটে লাগছে। আবৃত্তি অভিনয়কে অনুসরণ করবে কেন? এবং অভিনয় ও আবৃত্তি পরস্পরের পরিপূরক হবেই এমন কোন তো কথা নেই।

প্রত্যেক শিল্প মাধ্যমের নিজের নিজের সীমা আছে। গান ছবি হয়না—ছবি ভাস্কর্য হয় না—ভাস্কর্য কবিতা হয় না। তবু প্রত্যেক আর্ট ফর্মের কাছ একটা চ্যালেঞ্জ থাকে তার নিজের সীমার বাইরের কিছুকে স্পর্শ করার। বহু গান শুনে মনে ছবি ভেসে আসে—বহু ছবি ভাস্কর্যের অটুট ডৌলকে মনে পড়িয়ে দেয়, ভাস্কর্য কখনও কখনও কবিতার মত ছন্দময় হয়ে ওঠে। আবৃত্তি ও অভিনয়ও এই রকম পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ নাট্যাংশ পাঠ ও কাব্যনাট্য পাঠের সংলাপ উচ্চারণ কি একইরকম হবে? মঞ্চাভিনয়ে বা এই ধরনের পাঠে, উচ্চারণে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত কি?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর ২য় প্রশ্নের উত্তরেই দেওয়া আছে।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তির উপযোগী অথবা অনুপযোগী এইভাবে কবিতা নির্বাচন করা কি সম্ভব?

উত্তর ঃ হ্যাঁ সম্ভব তো বটেই প্রয়োজনও বটে। পৃথিবীর কবিতা সাহিত্যের একটা বড় অংশই বোধহয় তথাকথিত আবৃত্তিযোগ্য নয়। তা শুধু পাঠকের রসগ্রহণের জন্যে।

প্রশ্ন ঃ ইদানীং বলা হয়ে থাকে আবৃত্তি স্মৃতিনির্ভর না হলেও ক্ষতি নেই। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ আবৃত্তি স্মৃতি থেকে বলতে পারলে নিশ্চয়ই শ্রোতাদের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তিকারেরও একটু বেশি ভালো লাগতে পারে। তবে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায় না। আবৃত্তি তো একটা performance। সেটা বই দেখে বলেও যদি কেউ এমন রসসৃষ্টি করতে পারেন যা শ্রোতার হৃদয়সংবেদ্য হয় তাহলে স্মৃতিনির্ভর না হলেই বা ক্ষতি কি?

প্রশ্ন ঃ আমার শেষ প্রশ্ন, আবৃত্তিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি শিল্প বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ আবৃত্তি অভিনয়েরই মত পরনির্ভর কলা। কবিতা বা নাটক যেমন সৃষ্টিমূলক, আবৃত্তি ও অভিনয় প্রাথমিক ভাবে সেখানে সৃষ্টিমূলক নয়। তার কাজ ব্যাখ্যাতার। তবু তা শিল্প হয়ে ওঠে কখনও কখনও ব্যাখ্যাতার বোধ মনন অভিজ্ঞতা বা জীবন দর্শনের উজ্জ্বল প্রকাশে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব.........২

প্রশ্নকর্তা, লেখক, উত্তরদাতা—অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রশ্ন ঃ সুললিতভাবে কবিতা পাঠ এবং কবিতা আবৃত্তি, এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ 'সুললিত'—এই শব্দটি আমাকে খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। প্রথমে 'ললিত' তার আগে 'সু' রয়েছে। এখন সুললিতভাবে পাঠ করার মতো তো সব কবিতাই নয়। কিছু কিছু কবিতার পাঠের ক্ষেত্রে এই সুললিত বিশেষণটির প্রয়োগ হতে পারে সব কবিতায় নয়। সুললিত কথাটি কিন্তু অনেক ফাঁক রেখে দেয়। তার কারণ হচ্ছে যিনি পড়ছেন এবং যিনি শুনছেন এই দুজনের বোঝার সমতা না থাকলে খুবই অসুবিধের সৃষ্টি হয়। যেমন হয়েছিল, বিটোফেন-এর Ninth Symphony অথবা মোৎসার্ট-এর Moonlight sonata-র ক্ষেত্রে। তেমনি আর কি। যেমন ডি এল. রায় এই কথাটি কি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—"তোর বকবকানি ফোঁসফোঁসানি তাও কবিত্বের ভাব মাখা / তাও ছাপালি গ্রন্থ হল নগদমূল্য এক টাকা।" কিন্তু আজকে নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান লোক বলেননা যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য।

এমনকি একটা অনুচ্চারিত প্রশ্নও বরং থেকে যায় একজন বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে যে কোথাও কোথাও আর একটু অসরল হলে যেন আরো ভালো হত না? আরো একটু সংক্ষিপ্ত, আরো একটু সংহত, আরো একটু অসরল?

এভাবেই এক যুগের তথাকথিত দুর্বোধ্যতা পরবর্তী যুগে গৃহীত হয়ে যায়। ছবির ক্ষেত্রে, গানের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই হয়। আজকের একজন আবৃত্তিকার যে ভঙ্গীতে আবৃত্তি করেন, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তিনি যদি পিছিয়ে যান এবং মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেন তখন সেখানকার দর্শকরা সেই কবিতাকে বা আবৃত্তিকে কি গ্রহণ করতে পারবেন? পারবেন না। তখনকার সময়ে সদ্য প্রবাহিত যে ধারা সেই ধারার সঙ্গে যে যোগ ছিল তার থেকে অনেক স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে এখনকার ধারা। ফলে গ্রহণ করতে তাঁর অসুবিধে হয়। সুতরাং এই দুর্বোধ্যতা কথাটা সাময়িক, আপেক্ষিক এবং খানিকটা—ক্ষমা করবেন, অমার্জিত সংস্কারের কথাও বটে। তাই এই প্রশ্নটির অন্য কোনো উত্তর প্রয়োজনীয় বোধ করছি না।

প্রশ্ন ঃ কোন কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষ পংক্তির পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ কবিতা লেখার কারণে আমার সৌভাগ্য হয়েছে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিদের সঙ্গে কবিতাপাঠ করার। এবং সেখানে গিয়ে আরও সৌভাগ্য হয়েছে, যেমন লক্ষ্ণৌতে, দিল্লীতে সারা রাত্তির বসে

শায়েরী কায়ফী আজমী, সর্দার আলী জাফরী, ফিরাক গোরখপুরী এমনকি তামিল, মালয়ালম ইত্যাদি ভাষাতেও অনেক কবির কবিতাপাঠ শোনার। তো, আপনারও জানেন যে উর্দু কবিতাতে এমন কি হিন্দী কবিতাতেও বহু সময় একটি পংক্তিকে দু-তিনবার উচ্চারণ করা হয় যাতে সেটা খানিকটা আরও বেশি করে কমিউনিকেট করে। কিন্তু আবার আমরা দেখেছি যে দক্ষিণ ভারতের কবিতাপাঠের সময় একটা সুরপ্রবাহ, তালপ্রবাহ, এমনকি বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করে। কবিতাপাঠে তা একটা সুরেলা আবহ তৈরি করে।

এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে, বাংলা কবিতা—এটা অনেক বেশি পাঠযোগ্য কবিতা হয়ে গেছে। বারবার উচ্চারণ এবং তার সঙ্গে অবিলম্বে দর্শকের তারিফ এই ব্যাপারটায় মাঝে মাঝে বাঙালী কবির রুচি Disturbing বলে বোধ করে। কারণ তিনি আস্তে আস্তে একটা গোটা কবিতার প্রতিমা গড়ে তুলতে চাইছেন। তিনি মনে করেন যে এইভাবে একটি বা দুটি পংক্তি বারবার আবৃত্তি করলে কবিতায় সামগ্রিকতা, যেটা কিনা প্রায় ক্ষেত্রেই মার খাবে। তখন কোনো একটা নির্দিষ্ট পংক্তির প্রতি শ্রোতা বা দর্শকের নজরটা অনেক বেশী করে পড়ে যায়। আর একটা পংক্তিই তো আর একটা গোটা কবিতা নয়। এটা তো একটা পরিণতি, এটা তো আস্তে আস্তে একটা জিনিসকে গড়ে তোলা। ফলে আমার মনে হয় এই উর্দু রেওয়াজ বা হিন্দী রেওয়াজ এটা এমন একটা স্তরে পৌঁচেছে যে বাংলা কবিতাতে উপলব্ধির ব্যাপারে কখনও কখনও অথবা প্রায়শই অসুবিধের সৃষ্টি হয়।

তবে আবার এটাও দেখা গেছে যে, প্রথম পংক্তিটি আমরা কখনও কখনও পুনরুক্তি করে থাকি, সেটা যদি একটা বিচ্ছিন্ন পংক্তি হয়। ধরুন প্রথমে আমি একটা লাইন লিখেছি, তারপর space আছে, তারপরে লাইনটা আবার লেখা আছে। এখন এই প্রথম পংক্তিটা—সেটা আমি নিশ্চয়ই এই কারণেই আলাদা করে লিখেছি এবং space দিয়েছি ও তার পরের পংক্তিগুলো আলাদা করে বিচ্ছিন্ন করে লিখেছি যাতে করে প্রথম পংক্তিটা আলাদাভাবে সমধিক মনোযোগ দাবি করে। এর ফলে আমরা কখনও কখনও মনে করি যে কোন কোন জায়গায় প্রাসঙ্গিক ভাবেই একবারের বেশি দুবার হয়তো বা বলা যেতে পারে যদি সেই প্রাথমিক পংক্তির ভেতরে এমন নাটকীয়তা থেকে যায়, যে নাটকীয়তা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে আরেকটু স্পষ্ট হতে পারে। এছাড়া কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন এক কবির কবিতা অধিকাংশ সময়েই

একই ধরনের হয়ে থাকে যেমন জীবনানন্দ (আলোচকের মন্তব্য ঃ খুবই সাহসী প্রশ্ন)। এর থেকে কি বেরিয়ে আসা যায় না?

উত্তর ঃ জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' বা 'সাতটি তারার তিমির' যিনি পড়েছেন, অথবা 'বেলা অবেলা কালবেলা' যিনি পড়েছেন তিনি প্রশ্ন করার ব্যাপারে এতখানি সাহসী হতে পারতেন না বলেই আমার ধারণা। তবে কবির তো একটা dominant মেজাজ থাকেই। এমন একটা প্রধান ভঙ্গী বা trend থাকে, যেটাই কিন্তু সেই কবিকে বিশিষ্ট করে তোলে আর পাঁচজনের থেকে। সেখানে জীবনানন্দের এই নিঃসঙ্গতাবোধ এই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ইত্যাদির যে স্বৈরাচারী হাওয়া তাঁর কবিতায় আছে—সেই অমোঘ হাওয়া যা কিনা তছনছ করে দেয় আমাদের চারপাশ। এটাই তো জীবনানন্দের প্রধান মেজাজ। এটাই তাঁর বহু কবিতার প্রথম মানসিক বেগকে আঙ্গিকের দিক থেকে, শব্দ নির্বাচনের দিক থেকে ফুটিয়ে তুলেছে। এতে তো বিস্ময়ের কিছু নেই। আবার তাঁরই হাত দিয়ে অন্য মেজাজের কবিতাও সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়া আর একটা কথা, কোন কোন কবি মূলত একটি ধারাকে আজীবন অনুসরণ করে যেতে ভালবাসেন—যেমন ইয়েটস্, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আবার কোন কোন কবি বারবার বাঁক পাল্টান—যেমন বিষ্ণু দে, যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। "পা চালিয়ে ভাই" এবং 'পদাতিক'—চল্লিশ বছরের দূরত্বে যে কবিতার দুই ধারা, এই ধারার কত পার্থক্য, কিন্তু কোনখানেই তো এই ধারার বদল সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে প্রাধান্য থেকে অপ্রাধান্যে ঠেলে দেয়নি। ফলে এটা কি এভাবেই বিচার করা যাবে না, দাবি করা যাবে না যে সেই কবি তাঁর মর্জি, তাঁর চেতনা, তাঁর অনুভূতি অনুযায়ী হয়ত একটা ধারাকেই প্রকাশিত করতে পারেন সারাজীবন নানাভাবে। আবার অপর একজন কবি বারবার পালাবদলের ভেতর দিয়ে তাঁর কবিতার রূপান্তর ঘটাতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তি করতে গেলে সঙ্গীত বা অন্যান্য স্বতন্ত্র শিল্পের সাহায্য গ্রহণ আবৃত্তি শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর না সহায়ক?

উত্তর ঃ ডাইলান টমাস আমেরিকার একজন বিখ্যাত কবি। তিনি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন। ডাইলান টমাস একজন অসামান্য আবৃত্তিকার ছিলেন। কবিদের ভেতরে এতবড় আবৃত্তিকার আর বোধহয় কেউ জন্মাননি। তিনি যখন যেখানে যেতেন কোন ধ্বনি ভাল লাগলে তিনি সেটা 'টেপে' ধরে রাখতেন। আমি ডাইলান টমাসের রেকর্ড শুনেছি। হয়তো ঝর্ণার ওপর কোন কবিত' লিখেছেন, সেটা পড়তে পড়তে,

বলতে বলতে, আবৃত্তি করতে করতে কোন জায়গায় আবৃত্তির স্বরগ্রাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট জলের শব্দ, ঝর্ণার শব্দের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আবার কখনো কখনো বিষাদে বিলীন কবিতা আবৃত্তি করতে করতে একটা মেলো হার্মনি শোনা যাচ্ছে। এইরকম খুব অস্ফুট আবহসঙ্গীতের মতো ব্যবহার, যন্ত্রের বা কণ্ঠসঙ্গীতের কখনো কখনো ব্যবহার—তাঁর কবিতার ভাবমণ্ডলকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে তা আমি দেখেছি। কিছুকাল আগে আমি টম গান-এর একটা কবিতাপাঠ শুনেছিলাম এল. পি-তে, তো তার সঙ্গেও আবহসঙ্গীত যুক্ত হয়েছিল। রবিশঙ্কর সেতার বাজিয়েছিলেন এবং টম গান কবিতা পড়েছিলেন। কবিতাটির নাম The Rain, আর সেই rain-এর সঙ্গে খুব মৃদু মল্লারের আলাপ রবিশঙ্কর করেছিলেন। এখন রবিশঙ্করের মতো এতোবড়ো একজন প্রতিভা এবং আধুনিক কালের ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি টম গান, তাঁরা পাশাপাশি বসে এটা কম্পোজ করেছেন। আবার ইয়েহুদি মেনুহিন-এর বেহালার সঙ্গেও আমি আবৃত্তি শুনেছি। হয়তো পারস্পরিক সাহায্য করে, হয়তো পুরোপুরি সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যার যে চেহারা তাকে ফুটিয়ে তোলে আরও বেশি করে।

সুতরাং কোথাও কোথাও হতে পারে তবে সব জায়গাতেই নয়, এমনকি অনেক জায়গাতেই নয়। আমি বরং পছন্দ করি যে আবৃত্তিকার তিনি অন্য কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের ক্ষমতায়, নিজের যোগ্যতায়, নিজের দক্ষতায় একটা অবিশ্বাস্য জিনিষকে বিশ্বাস্য করে তুলবেন।

রবীন্দ্রনাথ হরেকরকমের মঞ্চসজ্জায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, অভিনেতা এমনভাবে অভিনয় করবে যাতে অভিনয়ের সমস্ত অবাস্তব ব্যাপারটা সেটা সত্যি সত্যিই ঘটছে না—সেটা লোকে দেখতে দেখতে মনে করবে real এবং এইখানেই একজন আবৃত্তিকারের যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতা প্রমাণিত হবে ততবেশি যত তিনি সম্পূর্ণ নিরাভরণ, নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কেবল তাঁর আবৃত্তির ভেতরে এমন বিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারছেন, এমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারছেন যে সমস্ত কবিতাটা তার পরিবেশ নিয়ে, তার সত্ত্বা নিয়ে, তার সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে পাঠকের সামনে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমি এই জিনিষটাকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আমার আশঙ্কা যে, বাদ্যযন্ত্র বা অন্যান্য অনুষঙ্গ যদি এর সঙ্গে নিয়মিত ব্যবহার হতে থাকে তবে আবৃত্তিকারের কাজ অনেক কমে যাবে, দক্ষতা কমে যাবে এবং আবৃত্তি-শিল্পের যে মূলরূপ, এর অনেক বিকৃতি এবং হেলাফেলা ঘটবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব.........৩

প্রশ্নকর্তা, লেখক, উত্তরদাতা—অশোক পালিত

প্রশ্ন ঃ একজন কবি তাঁর কবিতার সঠিক অর্থ বা তাৎপর্য বুঝতে পারবেন, যেহেতু তিনিই কবিতার স্রষ্টা। কবিতার ছন্দ সম্পর্কে সচেতন হয়েই তিনি কবিতা রচনা করেন। এর সঙ্গে সুকণ্ঠ, উপযুক্ত স্বরক্ষেপন, স্পষ্ট ও যথাযথ উচ্চারণ যোগ হ'লে হয়ত ভাল আবৃত্তিকার হওয়া যায়। কিন্তু এ সব গুণ থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবিদের আবৃত্তিকার হিসেবে সফল বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আপনার ভাবনা যদি জানান—

উত্তর ঃ কবিরা তো কবিই, তাঁরা তো আবৃত্তি করেন না, আবৃত্তিকার হ'তেও চান না। তাঁদের চর্চা কবিতা লেখার, আবৃত্তি করার নয়। আসলে আবৃত্তি মূলত কবিতা-ভিত্তিক এক বাক্‌শিল্প, প্রয়োগ শিল্প। যাকে বলে পারফর্মিং আর্ট। এই আর্টের চর্চা তো কবিরা করেন না, করার দরকারও বোধ করেন না। যতই না তাঁদের আবৃত্তি করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকুক, তাঁরা এ ভাষা শিল্পের এক রূপের অনুশীলন করেন মাত্র, এই পর্যন্তই তাঁদের দায়বদ্ধতা। তবে তাঁরা যখন কবিতা পাঠ করেন তখন সে পাঠে আবৃত্তির খোঁজ না করাই সঙ্গত। তাঁদের কবিতা পাঠে আবৃত্তির প্রয়োগগত চমৎকারিত্ব আশা করাও উচিত নয়। তাঁদের সাফল্য নির্ভর করে উত্তরোত্তর ভালো কবিতা লেখায়, আবৃত্তিকারের সফলতা আসে উত্তরোত্তর ভালো ভাবে আবৃত্তি করায়।

প্রশ্ন ঃ 'কবিতা আবৃত্তিতে নাটকীয়তা'—সম্পর্কে কবি ও আবৃত্তিকার হিসেবে আপনার মত কী?

উত্তর ঃ কবিতায় কমবেশি নাটকীয়তা থাকে, এ নাটকীয়তা থিয়েটারি একদমই নয়। একধরনের চাপা, অন্তর্লীন, শব্দে শব্দে সংঘর্ষ থেকে উঠে আসা নাট্য। কখনো কবিতায় বিবরণ থাকে, দৃশ্যে দৃশ্যান্তরে ক্রমিক উন্মোচন থাকে, ঘটনা থাকে, সে ঘটনা ধাপে ধাপে তুঙ্গে উঠে যায়; যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস,' 'আফ্রিকা,' 'বাঁশি,' 'সাধারণ মেয়ে' প্রভৃতি কবিতাগুলি। এইসব কবিতার আবৃত্তির সময়ে প্রার্থিত নাটকীয়তা প্রকাশ করা আবৃত্তিকারের পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত। আবার জীবনানন্দের 'বনলতা সেন,' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনী বাড়ি আছ,' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখে নি,' শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' ইত্যাদি কবিতার আবৃত্তি অনুচ্চ ও অন্তর্লীন সূক্ষ্ম নাটকীয়তায় ভরা থাকে। তাকেও ঠিকঠাক প্রকাশ করতে হয়

আবৃত্তিকারকে। এমনকি, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিদের কিছু কিছু ভাষণধর্মী উচ্চকণ্ঠ কবিতার আবৃত্তিতে মঞ্চের নাটকীয়তা বা অতিনাটকীয়তা পরিহার করা অবশ্যই কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ শ্রুতিনাটক ও আবৃত্তির মধ্যে কোন মিল আছে কি? যদি থাকে, তা কী ধরনের?

উত্তর ঃ না, কোন মিল নেই। যদিও দুটোই বাক্‌শিল্প বা প্রয়োগশিল্প, যাকে বলে পার্‌ফর্‌মিং আর্ট। আবৃত্তির ভিত্তি মূলত কবিতা আর শ্রুতিনাটকের ভিত্তি নাটক। কবিতার সঙ্গে নাটকের সাধারণত কোন মিল নেই। কবিতায় কবির বিবৃতির সঙ্গে কখনো-সখনো সংলাপ থাকে কিন্তু নাটক সংলাপ সর্বস্ব। কবিতার মধ্যে স্থিত সংলাপ আবৃত্তি করতে হবে কবিতার স্বভাব অনুযায়ী, মঞ্চাভিনয়ের মতো উচ্চারণ করে একেবারেই নয়। শ্রুতিনাটক দাবি করে বাচিক্ অভিনয়ের, বেতার নাটকের অভিনয়ে যা করা হয়।

অবশ্য কাব্যনাটক যাকে ইংরেজিতে বলে পোয়েটিক্ ড্রামা তাকে আবৃত্তি করা যায় কিন্তু তার যথার্থ প্রয়োগ বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমে। সবচেয়ে সঙ্গত হয় যদি তাকে মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যদি কাব্যনাটক পাঠ করা হয় সেখানে কাব্যনাটকটির স্বভাব অনুযায়ী বাচিক অভিনয়ের প্রতি জোর দিতে হবে।

তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কৌশলের কিছু কিছু প্রকরণের মিল আছে। তা হোলো উচ্চারণ, স্বরক্ষেপন ও ব্যঞ্জনা সঞ্চার করার ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন ঃ সম্মেলক আবৃত্তির বিষয়ে কিছু বলবেন?

উত্তর ঃ কিছু কিছু গান থাকে যাদের পরিবেশন করা হয় সমবেত কণ্ঠে, যাকে ইংরেজিতে বলে কোরাস্। সেইরকম কিছু কিছু কবিতা আছে যাদের সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করা হয়, যাকে বলে সম্মেলক আবৃত্তি।

এক্ষেত্রে যেটা দরকার সেটা হোলো, সংশ্লিষ্ট আবৃত্তিকারদের দলগত চেতনা বা টীম্ কন্‌সাসনেস্। যেসব স্বর বা পর্দা কবিতাটি ছুঁয়ে যায় সেইগুলিকে একযোগে উচ্চারণ করতে হয়। পংক্তির আবৃত্তি করার সময়ে শুরু ও শেষ যাকে বলে ধরা-ছাড়া একসঙ্গে করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় বিভিন্ন কণ্ঠের শ্রুতিগত বৈসাদৃশ্য যেন প্রকট না হয়। সম্মেলক আবৃত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের এককভাবেও নিজেদের পরিশীলিত করতে হয়, প্রকরণের যাবতীয় কলাকৌশলের প্রয়োগ করতে হয় যথার্থ ভাবে, কবিতার মূলভাব বা স্পিরিটকে সঠিক অনুভব করা একান্ত জরুরী আর সেই

ভাবকে সমবেতভাবে আবৃত্তি করার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের শেষে। এক্ষেত্রেও শুধু, উচ্চারণ, স্বরক্ষেপন বড়ো কথা নয়, দরকার যেটা সেটা হল ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সময় বিচারকেরা সাধারণত কোন্ জিনিসটির উপর বেশি লক্ষ্য রাখেন?

উত্তর ঃ অন্যান্য বিচারকদের কথা বলতে পারিনা, তবে নিজের কথা বলতে পারি। লক্ষ্য রাখি—প্রতিযোগীর বলাটা যথার্থ আবৃত্তি হয়ে উঠছে কিনা। প্রতিযোগীর নির্দিষ্ট কবিতাটির অনুভব, ছন্দোচ্ছ্বাস, কণ্ঠসম্পদ, নিখুঁত উচ্চারণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপারটা এক সামগ্রিকতায় পৌঁছচ্ছে কিনা। আবৃত্তির 'ধ্বনি' (সাউণ্ড অর্থে নয়, এসথেঠিক বিউটি অর্থে) ঠিকমতো সংবেদনের সৃষ্টি করছে কিনা।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে তো বহু সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়ভার বহন করতে হয়। এই প্রতিযোগিতা এবং এর বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা কি বলে?

উত্তর ঃ প্রতিযোগিতা যখন হবেই, এর জলতরঙ্গ যখন রোধ করা যাবে না আর বিচারকের দায় যখন কাউকে না কাউকে বহন করতে হবেই, তখন এই গতানুগতিক ব্যবস্থাকে পাল্টাতে পারলে ভালো হয়। প্রতিযোগীদের সঙ্গে বিচারকের খোলাখুলি আলোচনার আয়োজন করতে হবে। নির্দিষ্ট কবিতা ছাড়া, বিচারকদের পছন্দমতো কবিতা বা গদ্য রচনা প্রতিযোগীকে আবৃত্তি করতে বা পড়তে হবে। শব্দের উচ্চারণ, অর্থ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের উদ্দেশ্য, ছন্দ, লয়, স্তবক বিভাজনের সম্ভাব্য কারণ, কেন আবৃত্তি করতে আসা, ইত্যাদি ধরনের কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আসতে হবে প্রতিযোগীকে।

আবার বিচারক যাঁরা হন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়েও তো প্রশ্ন তোলা যায়। কী হবে তাঁদের যোগ্যতা? এগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় এসে গেছে।

বিচারের নিরিখ কী হবে? সার্বজনীন নিরিখ নেই। ফলে, যত্রতত্র যে কেউ বিচারক হ'য়ে বসতে পারেন, বসেন। যোগ্য অযোগ্য একসঙ্গে বসে নম্বর দেন, বা দিতে হয় তাঁদের।

এইসব বিষয়গুলো একপাশে ফেলে রাখলে ঐ প্রতিযোগিতাই হবে নামে, আবৃত্তি তখন ভারমুক্ত হয়ে কোথায় যে চলে যাবে। ৪০ বার 'আফ্রিকা' শুনতে শুনতে তখন মনে হবে, বিচারকদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, আফ্রিকার কালো মানুষদের চেয়ে তা কম নয়।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তিতে উচ্চারিত হলে কি কবিতায় শরীরে দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয়? এই বাঞ্ছিত Dimension কি নিবিষ্ট পাঠে প্রাপ্তব্য নয়?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হয় কিনা জানি না, তবে নিবিষ্ট পাঠের চেয়ে 'আবৃত্তিতে উচ্চারিত' কবিতা অন্য এক ধরনের মাত্রা যুক্ত হয় বলেই আমার ধারণা।

নিবিষ্ট পাঠ আর আবৃত্তি মূলে একই। পার্থক্যটা গুণগত নয়, মাত্রাগত—যাকে ইংরেজীতে বলে কোয়ালিটেটিভ নয়, কোয়ানটিটেটিভ। নিবিষ্ট পাঠে পাঠকের চোখ আটকে থাকে কবিতার শরীরে, আবৃত্তিতে চোখ মুক্ত। আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বরের কলাকৌশল, কবিতার বোধ, আর তাকে প্রকাশ করার, উপভোগ্য করে তোলার যাবতীয় উপাদান কবিতার শরীরে 'বাঞ্ছিত dimension' এনে দেয়। যা নিবিষ্ট পাঠে সবটা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ দেশীয় ও বিদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যানুসারে রচিত মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যগুলিকে মহাকাব্য বলা যায় কিনা—যদি বলা যায় তাহলে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায় এই ধারাবলুপ্তির কারণ—এ বিষয়ে আপনার অভিমত।

উত্তর ঃ দেশীয় কাব্যশাস্ত্র বলতে আচার্য দণ্ডী-র 'কাব্যাদর্শ', বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' ইত্যাদি গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ করা আছে। আর বিদেশীয় কাব্যশাস্ত্র বলতে প্রধানত এ্যারিষ্টটলের পোয়েটিকস্ গ্রন্থে-ও মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে।

উভয়ক্ষেত্রেই মহাকাব্যের যে সব লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়াড-ওডিসি যে অর্থে স্বতস্ফূর্ত মহাকাব্য (Epic of growth or Authentic Epic) সেই বিচারে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের লেখা কাব্যগুলি মহাকাব্য নয়, এগুলিকে বলা হয় সাহিত্যিক বা আলংকারিক মহাকাব্য (Literary Epic)।

যে কাব্যে একটি দেশের বা একটি যুগের সমগ্র জীবনের রূপ, অভিজ্ঞতা, হৃদয়ভাব ও দর্শন প্রকাশিত হয় না, তা মহাকাব্য নয়। আসলে, মহাকাব্য একটি জনগণের সাহিত্য, মহাকাব্যের মধ্যে যে সমগ্রতার একটি বিশাল রূপ পাওয়া যায়, তা নানা জনের সৃষ্টি, কোনো একক মানুষের নয়। রেনেসাঁস পরবর্তীকালে ব্যক্তি-মানুষের ছাপ (Stamp of individualism) পড়ল সাহিত্যে, শিল্পে। মহাকাব্য লেখা হোলো বটে তবে তা আর সমগ্র মানবজাতির মানসচিত্র হোলোনা। হোলো লেখকদের সজাগ

প্রয়োগের শিল্পরূপ। তাই ভার্জিলের ইনিড, তাসখোর জেরুসালেম লিবা, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বা হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলি সাহিত্যিক মহাকাব্য, প্রাচীন Heroic Age-এর মহাকাব্য নয়।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে কয়েকটি যা মহাকাব্য লিখিত হয়েছিল, তার পরে আর হয়নি, হওয়ার প্রয়োজনও ছিলো না, কারণ, সমসময়ের দাবি ছিলো অন্যরকম।

তখন তো গদ্য উপন্যাস লেখার যুগ। গদ্যভাষ ন বাঙালীর মন মনন-কল্পনাকে জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সং , সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হচ্ছে অবাধ। মানুষের ক্ষুধা তখন খবর শোনার, কাহিনী শোনার। সে ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই দেখা দিলো উপন্যাস, তার পরে ছোটগল্প। ফলে, আলংকারিক মহাকাব্য, গাথা কাব্য ইত্যাদির ধারা লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করল। অর্থাৎ আধুনিক কালে এপিকের জায়গা নিয়েছে গদ্য উপন্যাস।

সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনে মাইকেলরা ভুল করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি।

